অনিল ঘড়াইয়ের নির্বাচিত উপন্যাস: প্রান্তিক মানুষের দিনলিপি

এম.ফিল উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

ওয়াসিম ইমরোজ

পরীক্ষার রোল নম্বর: MPBE194009

ক্লাস রোল নম্বর: ০০১৭০০১০৩০০৯

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৩৩৪৬২ (২০১৫-২০১৬)

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক:

ড. শম্পা চৌধুরী

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

মে ২০১৯

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করার পর থেকেই উপন্যাসের প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ জন্মায় এবং বিভিন্ন লেখকের উপন্যাস পড়তে শুরু করি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সূত্রে বাংলা সাহিত্যের দিকফলকের স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন উপন্যাসের সঙ্গে একে একে পরিচয় ঘটে। এভাবেই একদিন অধ্যাপকের আলোচনার মাধ্যমে পরিচিত হই অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসের সঙ্গে। সময় নষ্ট না করেই পড়তে শুরু করি *অনন্ত দ্রাঘিমা*। আমার সামনে উন্মোচিত হয় প্রান্তে থাকা মানুষদের জীবনের অনন্ত জটিলতা এবং যন্ত্রণার এক আলাদা ভুবন।

এরপর এম ফিল কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুবাদে ঠিক করলাম অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাস নিয়ে কাজ করার। পড়তে শুরু করলাম তাঁর লেখাপত্র, এবং যত পড়লাম ততই মুগ্ধ হলাম। এব্যাপারে অধ্যাপক ড. শম্পা চৌধুরী ম্যামের সঙ্গে আলোচনা করলাম এবং তিনি আমায় সাহস ও উৎসাহ জোগালেন। পরবর্তীতে তাঁর পরামর্শ মতো এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা।

সূচিপত্র

- ভূমিকা ৩-৭
- নিম্নবিত্তের উদ্ভব ও বাংলা সাহিত্যে নিম্নবিত্তের অবস্থান ৮-২৬
- ‘নুনবাড়ি’: নিম্নবিত্তের প্রথাবিরোধিতা ও প্রতিবাদের আখ্যান ২৭-৪০
- ‘মুকুলের গন্ধ’: নিম্নবিত্তের জীবনে প্রেম ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ৪১-৫৭
- ‘জন্মদাগ’: নিম্নবিত্তের জীবনের চিরকালীন অভিশাপ ৫৮-৭৩
- ‘নীল দুঃখের ছবি’: নিম্নবিত্তের দিনলিপি ও তাদের যন্ত্রণার ইতিহাস ৭৪-৯০
- রাজোয়ার বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ‘অনন্ত দ্রাঘিমা’: নিম্নবিত্তের জীবনে বিপ্লব ৯১-১১১
- উপসংহার ১১২-১১৫
- গ্রন্থপঞ্জি ১১৬-১১৮

ভূমিকা

কথাশিল্পী অনিল ঘড়াই ছিলেন অন্ত্যজ জীবনের রূপকার। অনিল ঘড়াইয়ের জন্ম ১৯৫৭ সালের ১ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রুক্মিনীপুর গ্রামে। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অনেকটা সময় কেটেছে নদীয়া জেলার কালিগঞ্জে; কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের-এর ডিপ্লোমা করেন।

অনিল ঘড়াই সম্পর্কে পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়,

"কে কোথায় যায়, কেন যায়, কার কাছে যায়, কেন কোন বিশেষ দিকে যায়, যেতে যেতে কেন থামে, থামার পরে ঘুরে যায় গতিমুখ, যেতে যেতেই কি ভাবে গোত্রান্তর ঘটে চরিত্রের, এক একটি অতি তুচ্ছ এলেবেলে চরিত্র। দীর্ঘকালীন শোষণে-শাসনে যারা মেরুদণ্ডহীন, তারাই কিভাবে হয়ে ওঠে অভিমন্যু সদৃশ্য যোদ্ধা, প্রতিকারহীন সমাজের পচা খড়গাদায় কীভাবে জন্মায়, পলকা হলেও প্রতিরোধের প্রতিবাদের মরিয়া উদ্ভিদ, অনিল দেখতে পান তার অণু-পরমাণু আর নিজে দেখতে দেখতেই আমাদেরও দেখান সে সবের অনুপুঙ্খসহ প্রতিটি মুহূর্ত, আর এইভাবে দেখা আর দেখানোর যুগ্ম প্রক্রিয়ার ভিতরে তিনি হয়ে ওঠেন একটি বিশেষ ভৌগোলিক পৃথিবীর স্ব-নির্বাচিত সম্রাট। স্বনির্বাচিত? তা তো বটেই। সিংহভূমের আদিবাসী অঞ্চলের অন্ত্যজ ও ছিন্নভিন্ন বাস্তবতাকে অনালোচিত অন্ধকার থেকে সভ্যতার আলোয় তুলে আনার দুর্বহ ঝুঁকি নেওয়ার দায়িত্ববোধেই তো তিনি প্রমাণ তিনি এসেছেন ঘোড়ায় চেপে, তাঁর কোমরবন্ধে দীর্ঘকালীন অহংকারী তলোয়ার"। (কোরক,শারদীয়,১৩৯৭ পৃ. ২৮)।

অনিল ঘড়াই নিজে তাঁর রচনার উৎসমুখ বিষয়ে যে সব মন্তব্য করেছেন-

"আমরা যে বেঁচে আছি এই সত্য যখন বুকে হাত দিয়ে টের পাই, তখন ছানিপড়া চোখেও পৃথিবী অসম্ভব সুন্দরী, এক কথায় তিলোত্তমা। কিন্তু সুন্দরের পাশে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে অসুন্দর, তাকে তো অগ্রাহ্য করতে পারি না"। (সখের বাগানে শীতের রাত, শারদীয়, পৃ. ৬৪)।

এই সূত্রে তিনি আরও জানান,

"লেখালেখি হল মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনে সেই আগুন নিয়ে খেলা করার মতো ঝুঁকিদায়ক একটা খেলা। সব খেলার মত এ খেলাতেও হারজিৎ আছে, তবে এ খেলায় হেরে গেলেও কোন দুঃখ হয়না। জীবনটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেখার এমন নিষ্ঠুর খেলা বুঝি আর দ্বিতীয়টি নেই।...আমার লেখালেখির মধ্যে অভাব-অনটন, দারিদ্রতা, দুঃখবোধ আর গ্রামজীবন ঘুরে ফিরে আসে; কখনও আড়াল থেকে আবার সুখটাও সেখানে অসহায় বিবর্ণ এক ছায়া ফেলে। যা লিখতে চাই, তা এখনও সার্থকভাবে লিখতে পারি না বলেই হয়তো অনেক গল্পে একই কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে"। (সখের বাগানে শীতের রাত, শারদীয়)

বস্তুত লেখার মধ্যে এই অতৃপ্তিই এখন তাঁকে আরও সার্থকতায় পৌঁছে দিয়েছে।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *কাক*, প্রথম উপন্যাস *নুনবাড়ি*। তাঁর গল্প, উপন্যাস ও কবিতা মিলিয়ে গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি। তাঁর সাহিত্যের মূল সম্পদ দলিত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনচর্যা। নদীয়া ও মেদিনীপুরের গ্রামীণ মানুষ ও তাদের কথ্যভাষা যেমন উঠে এসেছে তাঁর রচনায়, তেমনি চক্রধরপুরে বসবাস করার সুবাদে সিংভূম অঞ্চলের কথ্যভাষাসহ সেখানকার মানুষের জীবনের ছবি পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্যে। ১৯৯০ সালে তাঁর প্রথম ছোটোগল্প প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়। নদীয়ার রাজোয়াড় বিদ্রোহ নিয়ে লেখা উপন্যাস *অনন্ত দ্রাঘিমা* ২০১০ সালে 'বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার' পায়। ১৯৯৯ সালে দলিত সাহিত্যের জন্য রাষ্ট্রপতির হাত থেকে তিনি পেয়েছিলেন 'সর্বভারতীয় সংস্কৃতির পুরস্কার'। এছাড়াও 'তারাশঙ্কর পুরস্কার', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'সোমেন চন্দ পুরস্কার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

ইংরাজি ভাষায় 'সাবঅল্টার্ন' শব্দটি সামরিক বাহিনী তথা সামরিক সংগঠনের সাথে যুক্ত। কিন্তু সমাজের নিরিখে বিত্তহীন, সর্বহারা, নীচের দিকে থাকা মানুষেরাই হল নিম্নবর্গ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *রথের রশি* নাটকে বলেছিলেন 'একদিন উঁচুতে আর নীচুতে বোঝাপড়া হবে'। কিন্তু সে

বোঝাপড়া এখনও হয়নি। নিম্নবর্গ তাই নিম্নবর্গই থেকে গেছে। ইংরাজি সাহিত্যে এই সাব-অল্টার্নদের নিয়ে আলোচনা অনেকদিন থেকেই শুরু হয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষ সমাজের শোষণে তাই বারবার হারিয়ে যেতে যেতে ফিরে এসেছে। তাদের কথা বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখার মাধ্যমে বারে বারে ফিরে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে বাংলা উপন্যাস লিখেছেন বিভূতিভূষণ- তারাশংকর- মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা কেউ বাংলা উপন্যাসে নিয়ে এলেন প্রকৃতিবাদ, কেউ বাস্তবতাবাদ। বাংলা উপন্যাসে এই চলমান ধারাটি বয়ে চলেছে আজও।

পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ি, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখ ঔপন্যাসিকরা বাংলা উপন্যাসে নিয়ে এলেন এক অন্য আখ্যান। যে আখ্যান সন্ধান দিল ভারতবর্ষের মধ্যে থাকা আরেক অন্য ভারতবর্ষের, উপনিবেশের মধ্যেই অন্য উপনিবেশ- নিম্নবর্গের উপনিবেশ। যার কথা রবীন্দ্রনাথ *গোরা* – তেই প্রথম বলেন। তবে ভারতবর্ষের আত্মপরিচয় নির্ণয়ের সে প্রক্রিয়াটি তখনও ছিল অসম্পূর্ণ। প্রথমে প্রকৃতিবাদ তারপর বাস্তবতাবাদের মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ- তারাশংকর বা তাঁদের পরবর্তী ঔপন্যাসিকরা দ্বিতীয়বার বাংলা সাহিত্যে ভারতবর্ষের আত্মার মানচিত্র খুঁজে দেখার চেষ্টা করেন। পথের পাঁচালী, *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, ঢোঁড়াই চরিত মানস, তিতাস একটি নদীর নাম,* উপন্যাসে সর্বপ্রথম অন্ত্যজ মানুষের চোখ দিয়ে বাংলা সাহিত্য অন্য সেই ভারতবর্ষের দিকে তাকায়।

মধ্যবিত্তের স্যাঁতস্যাঁতে দুঃখবেদনাকে আশ্রয় করে একটা সময় যখন বাংলা উপন্যাস গতানুগতিক একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল তখন এই বাস্তব-বিমুখ সাহিত্যকে বাস্তবমুখী করেছেন মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, সৈকত রক্ষিত, নলিনী বেরা, অনিল ঘড়াই প্রমুখ। আত্মবিস্মরণের পরিবর্তে বিপরীত প্রক্রিয়ায় শুরু হয়েছে

আত্মানুসন্ধান। যখন দেউলে হয়ে যাওয়া তৃতীয় বিশ্বজুড়ে শোনা যাচ্ছে আত্মহননের শব্দ তখনই বহুদিন আগে ফেলে আসা দিনের মতোই অবহেলা, অস্বীকার আর বিস্মৃতির ধুলোয় চাপা পড়ে যাওয়া নিম্নবর্গীয় জনজীবনের ইতিহাস আবার উন্মুক্ত হচ্ছে।

অনিল ঘড়াই তাঁর জীবনে পঞ্চাশটিরও বেশি ছোটোগল্প উপন্যাস লিখেছেন। তিনি নিজে নিম্নবর্গের মানুষ হওয়ার জন্য তাঁর প্রায় সব লেখাতেই বিত্তহীন মানুষদের কথা এসেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *নুনবাড়ি* (১৯৮৯) ছিল নুনমারা সম্প্রদায়ের একটি অবহেলিত মেয়ের ঘুরে দাঁড়ানোর আখ্যান, যার পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে মলঙ্গী সমাজের জীবন ছবি। *মুকুলের গন্ধ* (১৯৯৩) লেখা হয়েছে জগেন জমাদারের পরিবারকে কেন্দ্র করে। *মেঘ জীবনের তৃষ্ণা* (১৯৯৬) উপন্যাসে তিনি ধরতে চেয়েছেন হাঁড়ি সম্প্রদায়ের জীবন, সংস্কৃতি, সংস্কার, লোকাচার, ঐতিহ্য, জীবিকার ছবি। *দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান* (১৯৯৭) বিহারের আদিবাসী জনজাতির আখ্যান। দৌড়বোগাড়ার নদীতে শীতের মরশুমে স্থানীয় আদিবাসী মানুষেরা সোনা খুঁজতে যায়। এটা তাদের জীবিকা। অখ্যাত এই নদী ও তার পার্শ্ববর্তী আদিবাসী জনজীবনই উঠে এসেছে লেখকের এই রচনায়। *নীল দুঃখের ছবি* (২০০১) কাকমারা সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস। এরা উদকাঠি, নজরকাঠি বেচে সংসার চালায়, শূকর পালন করে। আসল জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি। *পাতা ওড়ার দিন* (২০০২) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রাস্তা তৈরির শ্রমিকদলের সর্দার ভানুয়া। *সামনে সাগর* (২০০৩) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ভূমিহীন, সহায় সম্বলহীন কিছু মানুষ, দীঘার সমুদ্রকে অবলম্বন করে যারা বেঁচে আছে। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ তথা বাংলা উপন্যাসের একটি স্মরণীয় কীর্তি *অনন্ত দ্রাঘিমা* (২০০৯)। এই মহৎ উপন্যাসে এক প্রান্তিক জনজীবনের ছবি বিস্তৃত পরিসরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অনিল ঘড়াইয়ের সমস্ত লেখাই আসলে মাটিকে চেনা এবং তাকে ভালোবাসতে শেখারই কাহিনি।

এর আগে বাংলার নিম্নবিত্ত সমাজকে নিয়ে নানা গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে কিন্তু অনিল ঘড়াই কোথাও যেন ব্রাত্যই থেকে গেছেন। তাঁকে নিয়ে সেরকম কোনো গবেষণাধর্মী কাজ হয়নি। তাই, অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসে নিম্নবিত্ত জনজাতির মানুষজনের সংস্কার, পেশা, বেঁচে থাকা ইত্যাদি বিষয় কেমনভাবে উঠে এসেছে সেটাই এখানে অনুসন্ধানের বিষয়।

প্রথম অধ্যায়

নিম্নবিত্তের উদ্ভব ও বাংলা সাহিত্যে নিম্নবিত্তের অবস্থান

নানা ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায় গোষ্ঠীর রীতি-নীতি, অনুশাসন-বিশ্বাস-সংস্কৃতি আচার-সংস্কার-প্রথার সমন্বয়ে ঐতিহ্যবাহী সনুন্নত ভারতভূমি। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে এখানে রচিত হয়েছে মহাকালগর্ভ-উত্থিত এক একটি যুগ-অধ্যায়। রাজতন্ত্রের প্রবহমানধারা, প্রবল জয়োদ্ধত দেশি বা বিদেশি শক্তির অভিঘাতে ক্ষত বিক্ষত এর মাটি, এর মানুষ। সেই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আর্য -অনার্যের সংঘাত, ক্রমে যুগান্তরে বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঐকান্তিক বাসনা, প্রতিবাদী ভাষার ঐকতান রক্ষা বা সংহতি প্রতিস্থাপনের শপথ ইত্যাদি প্রবাহিত হয়ে চলেছে নতুন সৃষ্টি ও জীবনধর্ম প্রতিষ্ঠার অভিমুখে।

পশ্চিমবাংলার ৩৮টি আদিবাসীগোষ্ঠীর মধ্যে ১৬টি গোষ্ঠী অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুন্ডা, বিরহড়, পাহাড়িয়া, নাগেশিয়া, ভূমিজ, মদেশিয়া(কিসান), লোধা প্রভৃতি আদিবাসী দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ওঁরাও এবং মঙ্গোলীয় ভাষাগোষ্ঠীর ‘নাগা’ প্রভৃতি আদিজনজাতির অবস্থান, জীবনযাত্রা বা কোন কোন উপজাতির প্রব্রজনের কথা লেখা হয়েছে ইতিহাসে।

আদিবাসীদের ইতিহাস বলতে বোঝায় তাদের দুর্ভিক্ষ, মহামারি-মড়ক, বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, স্থানান্তরকরণ বা বাস্তুত্যাগ, তাদের আর্থনীতিক ইতিহাস। কিন্তু আর্যরা তাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেনি। আর্যরা তাদের ইতিহাস বেদ-পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ করেছে, আর অনার্যরা সেখানে থেকেছে বঞ্চিত।

স্বভাবত, আদিবাসীরা সহজ-সরল, শান্ত অথচ জেদি, প্রখর আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ও কঠোর পরিশ্রমী। তাদের সহজ ও শান্ত জীবনে যখন তথাকথিত সভ্য সমাজের শোষণ অবহেলার মাত্রা বেড়ে যায় তখন তাদের মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিশোধ-প্রতিরোধস্পৃহা। 'বণিকের মানদণ্ড যেদিন রাজদণ্ডে' পরিণত হল সেদিন দেশের বাকি মানুষদের মতো আদিবাসী মানুষের ওপরেও নেমে এল নির্মম আঘাত। শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার প্রতিবাদে আদিবাসীরাও একসময় স্বাধীনতা রক্ষায়, শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সংগঠিত হল 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'রাম্পা বিদ্রোহ', 'ভীল বিদ্রোহ', 'মুন্ডা বিদ্রোহ', 'কোল বিদ্রোহ'- এর মতো প্রতিবাদী আন্দোলন। আদিবাসী বিদ্রোহগুলি ঘটেছে মূলত ভুমিকে কেন্দ্র করে, শোষণ-পীড়নজনিত শোক-তাপ, দুঃখ-কষ্ট-দুর্ভোগের কারণেই। জমিদারদের অত্যাচার, প্রতারণা মূলত আদিবাসীদের অরণ্যকেন্দ্রিক ভুমিকে কেন্দ্র করেই। অরণ্য-পাহাড়ে আজন্ম লালিত-পালিত আদিবাসীরা অক্লান্ত শ্রমে অরণ্য সাফাই করে কিংবা পাহাড় কেটে বসত গড়ে তোলে, তৈরি করে চাষাবাদ যোগ্য জমি। তারপর তাদের একপ্রকার ঠকিয়ে জমিদার-মহাজান তা গ্রাস করে। তারা সেই জমির খাজনা বৃদ্ধি করে। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করায়,যাকে বলে 'বেঠবেগারি'। লক্ষণীয়, এই 'বেঠবেগারি' ও খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শুরু হয় 'সরদারি লড়াই'।

উল্লেখ্য, আদিবাসীদের উন্নয়নে ১৮৭০-এ Government of India কর্তৃক ভারতবিধি অনুযায়ী 'উপজাতি স্বতন্ত্রকরণ আইন' কার্যকর হয়। ১৯১৭ সালে গৃহীত হয় 'ভূমি হস্তান্তর আইন' বা 'Land Transfer Act'। এই আইনে বলা হয় বিনা অনুমতিতে আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তির জমি হস্তান্তর করা যাবে না। স্বাধীনতা উত্তরকালে আদিবাসী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতসরকারের

‘পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়’ অর্থ বরাদ্দ, চাকরিক্ষেত্রে ‘সরকারি সংরক্ষণ’, পশ্চিমবাংলায় ‘ভূমিসংস্কার আইন’ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচেষ্টা চোখে পড়ে।

আস্তে আস্তে সময় পাল্টেছে, বর্তমানে নিম্নবিত্তদের নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে, ইতিহাস তাদের জায়গা দিচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সে ইতিহাসও কিন্তু সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়। কারণ সে সব ইতিহাস উঠে এসেছে তথাকথিত উচ্চবিত্তের হাত ধরে। তারা নিজেদের মতো করে নিম্নবিত্তদের দেখেছে, তাদের বিচার করেছে এবং তারপর মতামত দিয়েছে। কিন্তু সেই মতামত কতটা নিরপেক্ষ, কতটা সঠিক সে সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ নিয়ে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক দুটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৮৫ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটিতে তিনি প্রস্তাব দেন যে, ‘সবার ওপরে নিম্নবর্গ সত্য’ এরকম মন্ত্র না আওড়ে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসাবে নিম্নবর্গকে কিভাবে নির্মাণ করা হয়, সেই প্রক্রিয়াগুলোকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। হাজার আওয়াজের ভিতর থেকে নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর আলাদা করে বের করে আনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ইতিহাসের দলিলে যে কণ্ঠস্বরই শুনি না কেন, তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নির্মাণ। এই নির্মাণের সামাজিক পদ্ধতিগুলি কী, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তা ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি পায়, সেসব প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কার করাই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাদের কাছে সেটাই সবচেয়ে বাস্তব প্রত্যাশা। কিন্তু, বাস্তবে তার অনেকটাই বিপরীত হয়, একদল নিম্নবর্গকে নায়ক হিসাবে দাঁড় করিয়ে এক ধরনের সাদাসাপটা ঐতিহাসিক রোমান্সের বদলে পাঠকের সামনে এবার এসে পড়ল সরকারি দলিল, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক, জাতীয়তাবাদী নেতার বক্তৃতা, সমাজবিজ্ঞানের প্রবন্ধের খুঁটিনাটি চুলচেরা বিশ্লেষণ। অনেকেই বলতে শুরু করলেন, নিম্নবর্গের ইতিহাস এবার ভদ্রলোকের ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে। কারণ,

আলোচনার লক্ষ্যবস্তু নিম্নবর্গের ক্রিয়াকলাপ থেকে ছাড়িয়ে সমাজ-রাষ্ট্রের অন্য সব এলাকাতে পৌঁছে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক পর্যায়ের 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' এর আলোচনায় অন্তত তিনটি সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনটি ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীদের পারস্পরিক বিতর্কে নিম্নবর্গী রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হল সাম্প্রদায়িকতা। এই নিয়ে বেশিরভাগ আলোচনায় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে হয়েছে- একটি হিন্দুত্ববাদী, অন্যটি সেকুলারপন্থী। দুই পক্ষ আসলে আধুনিক রাষ্ট্রক্ষমতা বিস্তারের দুধরনের কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করে চলেছে। দুটিই উচ্চবর্গী, কিন্তু তাতে নিম্নবর্গের নির্মাণ দুরকমের। দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রতিক 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' এর উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে, সেটা হল জাতিভেদ প্রথা। বিশেষ করে 'মণ্ডল কমিশন' বিরোধী আন্দোলনের পরে এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তথাকথিত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিগত পরিচয় গণ্য করা বা না করার মধ্যেও উচ্চবর্গের আধিপত্য বিস্তারের দুধরনের কৌশল কাজ করছে এবং নিম্নবর্গও তার সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্নভাবে এই ক্ষমতাতন্ত্রের বিরোধিতাও করছে, আবার সুযোগও নিচ্ছে। তৃতীয় বিষয়টি হল মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা। পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। কিন্তু তাই বলে নারীর কোন শ্রেণীগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই- একথাও ঠিক নয়। সুতরাং, নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি কিভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরও জটিল করে তোলে সেটাও গবেষণার বিষয়। এই তিনটি ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে

প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী এবং প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী রাজনীতির সমালোচনা তৈরি হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সিংহভাগ ধরে যে উচ্চবর্গীয় রাজনীতি ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, আগামীদিনে তার বিরোধী শক্তি হয়ত এইসব সমালোচনাকে অবলম্বন করেই সংগঠিত হবে। বামপন্থী ভাবনাচিন্তার জগতে অন্যদের তুলনায় 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' সেই সম্ভাবনাকে বেশি তাত্ত্বিক স্বীকৃতি দিতে পেরেছে তার অন্যতম কারণ হয়ত এই যে, পদ্ধতির দিক দিয়ে অত্যন্ত মৌলিক সমালোচনা এবং দিকপরিবর্তনও এখানে নিষিদ্ধ হয়নি। নিম্নবর্গের ইতিহাস যেমন অসম্পূর্ণ, পরিবর্তনশীল, নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চারও ঠিক তেমনি অবদ্ধ আর সচল থাকার প্রয়োজন। এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গের সংগ্রামের যথার্থ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে।

নিম্নবর্গকে নিয়ে ভাবনার বীজ বোনা হয়েছিল নিঃসন্দেহে আন্তোনিও গ্রামশির 'কারাগারের নোটবই' থেকে। কিন্তু সময় অতিক্রমের সাথে সাথে গ্রামসির নিম্নবর্গের চর্চার তাত্ত্বিক কাঠামো'র বেড়াজাল ভেঙ্গে একসাথে মিলেমিশে গেছে নিম্নবর্গ, দলিত, ব্রাত্য অন্ত্যজ, পতিত বা ছোট মানুষেরা ,এমনকি সংখ্যালঘু এবং নারীরা। 'নিম্নবর্গ' এর 'নিম্ন' শব্দটি কোন বর্গের কোন বিশেষ রকম দীনতার অবস্থানের বার্তাই যেন ঘোষণা করতে থাকে প্রতিনিয়ত। এই শব্দটির মধ্যে বিশেষত ঋণাত্মক মনোভঙ্গিও প্রকাশ পায়। 'নিম্ন' শব্দটি 'উচ্চ' এর অপর হিসাবেই শুধু ব্যবহৃত হয় না, 'নিম্ন' স্থানে তাকে প্রতিষ্ঠা করার উচ্চবর্গীয় কৌশলীকরণ কানুনের প্রতিও তা অবিরত ইশারা দিতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার অন্য নাম দেওয়া যেতে পারে নিম্নবর্গের চেতনার সঞ্চার।

আমাদের চেনা ইতিহাস, চেনা ভূগোলের বাইরের পরিসর জুড়ে এক প্রান্তিক দেশ বিরাজ করছে। ভারতবর্ষের নিম্নবর্গকে শুধু 'শ্রেণী' হিসাবে একটি পক্ষ নির্ধারণ করলে ভুল হবে, তাদের চেতনায়

জাত-পাত বা caste consciousness অন্যতম নির্ণায়ক। বর্তমানে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা তাই নিয়ে। ১৯৮৫ তে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বলেছিলেন- "History from below একটি গল্প কথামাত্র" কেননা, "ইতিহাসের দলিলে যে কণ্ঠস্বর শুনিনা কেন, তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নির্মাণ"।

একদিকে, নিম্নবর্গের নিজস্ব ইতিহাস ও কণ্ঠস্বর পেতে হলে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মতানুসারে এমন এক নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের প্রয়োজন, যারা সামাজিক অস্বীকৃতি এবং সামাজিক পদ্ধতিগুলির ভিতর থেকে নিম্নবর্গকে আবিষ্কার করে আনবেন। 'Can subaltern speak' প্রবন্ধে তিনি বলেন-

'In subaltern studies because of the imperialist epistemic, social and disciplinary inscription, a project understood in essentialist terms must traffic difference... their text articulates condition of impossibility as the conditions of its possibility.'

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বোঝাতে চেয়েছেন 'নিম্নবর্গের নির্মাণ'।

অন্যদিকে, রণজিৎ গুহ মনে করেন, ঐতিহাসিক নথিপত্রে নিম্নবর্গের চেতনার সাক্ষ্য প্রায় কোথাও-ই পাওয়া যায় না। সেই নথি তৈরি করছে উচ্চবর্গেরা। তিনি এক জায়গায় বলেন-

'নিম্নবর্গ যে তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা হতে পারে, একথা স্বীকার করে না বলে ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞান চর্চায় অধিকাংশ রীতিনীতি পদ্ধতিরই আমরা বিরোধিতা করি। এই বিরোধিতাই আমাদের প্রকল্পের চালিকাশক্তি।'

নিম্নবর্গের দিক নির্নয়ী ঐতিহাসিক ও রণজিৎ গুহের কথামতো মুক্ত স্বাধীন ও নিষ্কলঙ্ক ইতিহাস পাওয়া যায়নি বলে উচ্চবর্গের রাজনীতি, সংস্কৃতি আর মতাদর্শের ভিতর শুধু নিম্নবর্গের প্রতিকল্পটি নির্মিত হয়েছে, একথা হয়তো সত্য। কিন্তু সমগ্র সমাজ, প্রতিস্থান,ভাবাদর্শ এবং মানব সম্বন্ধের অগ্রসরে নিম্নবর্গ আজও অনুপস্থিত। তাই, জহর সেন মজুমদার বলেন-

'প্রকৃত জীবন নয়, প্রকৃত বাস্তব নয়- পাচ্ছি জীবন ও বাস্তবের ভ্রান্তি প্রতিবেদন। এই ভ্রান্তি প্রতিবেদনে নিম্নবর্গ সবসময়ই অনুপস্থিত।'

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গদের নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছে খানিকটা পরে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে প্রথম উপন্যাস লেখা হয়, কিন্তু তাঁর কোনো উপন্যাসে নিম্নবর্গ তথা আদিবাসী সমাজজীবনের ছবি উঠে আসেনি। কেবল প্রবন্ধসাহিত্যে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের স্তর হিসাবে আদিবাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। যদিও বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'(১৮৬৬) উপন্যাসের পটভূমি দক্ষিণবঙ্গ প্রত্যন্ত সীমানার সমুদ্রতটভূমি, সেখানকার প্রাক-অস্ট্রেলীয় শবর উপজাতীয় গোষ্ঠীর সুদীর্ঘকালের বাসভূমি। 'আনন্দমঠ'(১৮৮২) উপন্যাসে যে 'সন্ন্যাসী ও ফকির' বিদ্রোহের ইতিহাসের উল্লেখ আছে সেই বিদ্রোহ মূলত গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ পূর্ববঙ্গের যশোর খুলনা ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ হয়ে বীরভূম এবং বিহার রাজ্যের ছাপরা-চম্পারন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সেই সময়ে এইসব অঞ্চলে রাভা-মেচ-ভুটিয়া, রাজবংশী-কোচদের বসতি ছিল, তারা এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী ছিল।

বঙ্কিমযুগের পরবর্তী অধ্যায় রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যে আদিবাসীসমাজ জীবনের রূপাঙ্কন কোথাও গুরুত্ব পায়নি। রবীন্দ্রনাথ আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থান করেও আদিবাসীদের প্রতি মনোযোগী হতে পারেননি এবং সে কারণেই তাঁর সৃষ্টির বিস্তীর্ণ পরিসরে আদিবাসী সমাজজীবনের

প্রতিফলন যৎসামান্যই। বিংশ শতকের প্রথমার্ধের প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য জগদীশ গুপ্ত, পরশুরাম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নরেশ সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক গল্প-উপন্যাস রচনার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যকে যদিচ পুষ্ট করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে তাদের সাহিত্যে আদিবাসীসমাজ সম্পূর্ণ অধরা অপাংক্তেয় থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন আদিবাসীসমাজ উপেক্ষিত থেকে গেছে, তেমনি শরৎচন্দ্রও কেবল মধ্যবিত্ত জীবন ও তাদের অন্তর্লোকের রূপকার হয়েই রইলেন। বলা যেতে পারে, উভয়ের বাংলা সাহিত্য রচনায় আদিবাসীসমাজ উপেক্ষিতই থেকে গেল। এহেন অপূর্ণতা না থাকলে বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী চর্চার বৃত্ত যে আরও সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হত সেটা বলাই বাহুল্য।

এরপর, রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগ শুরু হয়, 'কল্লোল'- এর কাল(১৯২৩-২৯) বা বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-বিরোধিতার যুগ। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও একমাত্র শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লা কুঠির'-র ইতিহাস নিয়ে রচিত গল্পই বাংলাসাহিত্যের দরবারে আদিবাসীসাহিত্যের সৃষ্টির অভিধায় ভূষিত। তাঁর 'কয়লাকুঠি', 'মা', 'ঝুমরু' ইত্যাদি গল্পে আদিবাসী মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-অভিমান, আদিম স্বভাব ইত্যাদি ধরা পড়েছে কিন্তু সেখানে দারিদ্রজর্জর আদিবাসীদের জীবনসংগ্রামের জটিলতা কিংবা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, ঔপনিবেশিক শোষণ-পীড়ন তথা অর্থনীতিক সঙ্কট-মুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বা বিদ্রোহের ছবি নেই বললেই চলে।

রবীন্দ্র-উত্তরযুগে বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের সাহিত্যে আরণ্যক জীবন যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তাকে আদিবাসীসাহিত্য চর্চার আদি পর্ব বা অধ্যায় রূপে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'(১৯৩৯) উপন্যাসে অনাবিল প্রাকৃতিক পরিবেশে আদিবাসীদের সমাজকে দেখা যায়। সেখানে, সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা 'রাজগোঁড়' বংশের দোবরুপান্না বা তারই বংশধর জগরুপান্না-

ভানুমতিরা চরম দারিদ্রের মধ্যে জীবনযাপন করলেও তাঁদের কারও প্রতি কোন অভিযোগ নেই। মুলত, উপন্যাসে আদিবাসীদের অলৌকিকতায় বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আর্থনীতিক সংকট ইত্যাদির পরিচয় স্পষ্ট হলেও তাদের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোন আভাস নেই। এখানে, আদিবাসীরা মূল সমাজের সাথে অনেকটাই মিশে গেছে, যদিও পরবর্তীকালে আদিবাসী সম্পর্কে লেখকের বীক্ষা, ক্ষেত্রানুসন্ধান বা অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার কতখানি সমৃদ্ধ তা নিয়ে সমালোচকেরা প্রশ্ন তুলেছেন। আদিবাসী সম্পর্কে বিভূতিভূষণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা কথা হল,

"বুঝিনা কেন এক এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কি বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যতদিন যায় তত উন্নতি করে- আবার অন্যজাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই একস্থানে স্থানুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে? বর্বর আর্যজাতি চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চরক-সুশ্রুত লিখিল, দেশ জয় করিল, সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ভেনাস দা মিলোর মূর্তি, পার্থেনন, কোলোঁ ক্যাথিড্রাল গড়িল, দরবারী কানাড়াও ফিফথ সিমফোনির সৃষ্টি করিল-এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ি, বেতার, বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিল-অথচ পাপুয়া, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী,আমাদের দেশের ঐ মুন্ডা, কোল, নাগা, কুকিগন যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর?"[১]

কিন্তু, বিভূতিভূষণের এই ধারণা বা বিশ্বাস সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আদিবাসীদের সভ্যতার ইতিহাস, তাদের প্রাক-ইতিহাসের কথা, তাদের অর্থনীতিক উন্নয়নের অন্তরায় প্রাচীন-ব্যবস্থা-সংস্কার-অনুশাসন, প্রথা-কুসংস্কার ইত্যাদি এবং শিক্ষা-দীক্ষা, অগ্রগতি না হওয়ার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন বিষয় কাজ করে সে সম্পর্কে লেখকের সম্যক অভিজ্ঞতারই অভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত, 'আরণ্যক' –এ আদিবাসীদের জীবনযাত্রার বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। তাদের আর্থনীতিক উন্নয়নের যে শ্লথ গতি তার অন্যতম কারণ আদিম উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময় প্রথায় সুস্থির থাকার একনিষ্ঠ মনোভাব বা এক্ষেত্রে তাদের যথার্থ পথপ্রদর্শকের অভাব। লেখক, সাঁওতাল

বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী অন্যতম নায়ক দারিদ্রক্লিষ্ট দোবরুপান্না বীরবর্দি ও তার পরিবারবর্গের চিত্র তুলে ধরলেও বা দোবরুপান্নার রাজমর্যাদার ইতিহাস ব্যক্ত করলেও তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার, তার দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান বা প্রতিবাদ সম্পর্কে কোন কথা স্পষ্ট করে তোলেননি।

কিন্তু, দরিদ্র আদিবাসীদের জীবনালেখ্য রচনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি সচেতন, অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, সাবলীল ও বলিষ্ঠ। তারাশঙ্কর ভাগলপুর, রাজস্থান, সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের আদিবাসী অধ্যুষিত সাঁওতালদের জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'কালিন্দী' (১৯৪০) ও 'অরণ্যবহ্নি'(১৯৬৬) উপন্যাসে। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও যথাযোগ্য অনুধাবনের সাহায্যে সাঁওতালদের জীবিকা, আচার-রীতি, সংস্কার-প্রথা, উৎসব-অনুষ্ঠান, সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি, সাঁওতাল রমণীর বেশবাস বা সাজসজ্জা, অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে সাঁওতাল গোষ্ঠীর বিদ্রোহ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় তুলে এনেছেন অসীম দক্ষতায়। তারাশঙ্কর ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসকর্মী। তার ফলে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক ধারণা তাঁর উপন্যাসে নানাভাবে উঠে এসেছে, তার আদর্শ উদাহরণ হল 'ধাত্রীদেবতা'(১৯৩৯), 'কালিন্দী'(১৯৪০) প্রভৃতি উপন্যাস। 'চৈতালী ঘূর্ণি'(১৯২৮)-তে বামপন্থী আদর্শে প্রভাবিত শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন স্পষ্ট, সেখানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ বা শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি বা অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় যে, শ্রমিকদের ধর্মঘট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কিন্তু তরুণ নেতারা ভবিষ্যতে তাদের জয় সম্পর্কে আশাবাদী। আবার, 'কালিন্দী' (১৯৪০) ও 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬) উপন্যাসে আদিবাসীদের ভূমিকেন্দ্রিক লড়াই অন্যভাবে ফুটে উঠেছে। মূলত, আদিবাসীরা জমিদার-মহাজন ও হিন্দু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, তাদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ সেখানে শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই নামান্তর।

বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী অধ্যায়ে রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে আভির্ভূত হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত তিনি। মার্ক্সবাদে দীক্ষিত বা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী-সদস্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দর্পণ' (১৯৪৫), 'সহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬), 'চিন্তামণি' (১৯৪৬), 'আদায়ের ইতিহাস'(১৯৪৭) প্রভৃতি উপন্যাসে জমিদার-জোতদার-মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণির দ্বন্দ্ব ও মালিকের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিবাদী ভূমিকা বা সংঘর্ষ জোরালো হতে দেখা যায়। তাঁর সৃষ্ট 'পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী সৃষ্টি। পদ্মার উপকূলবর্তী জেলে সম্প্রদায়ের জীবন অসাধারণ দক্ষতায় সেখানে ফুটে উঠেছে।

তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিক পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাকথাসাহিত্যের আঙিনায় আদিবাসী সম্প্রদায় ও নিম্নবিত্ত মানুষদের নিয়ে লেখার জন্য সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম হলেন মহাশ্বেতা দেবী। বলা যেতে পারে, সে পথে, পথ-নির্মাণের প্রচেষ্টায় তিনি একক, আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তাঁর 'অরণ্যের অধিকার'(১৯৭৭), 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর'(১৯৮০), 'অক্লান্ত কৌরব'(১৯৮২), 'হুলমাহা'(১৯৮২), 'অপারেশন? বসাই টুডু'(১৯৭৭), 'দ্রৌপদী'(১৯৭৭), 'এম. ডব্লিউ বনাম লখিন্দ'(১৯৭৭) ইত্যাদি উপন্যাস ও গল্পে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। মূলত, ভূমিকে কেন্দ্র করেই আদিবাসী সাঁওতাল-মুন্ডা উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বা জমিদার-মহাজন, পুলিশ-দারোগার বিরুদ্ধে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী অন্যায়ভাবে ও পরিবর্তিত অর্থনীতির প্রভাব খাটিয়ে আদিবাসীদের ওপর জুলুম করেছে। কিন্তু, আদিবাসীরা তাদের অর্থনীতিক উন্নয়নের শ্লথ গতি থেকে মুক্তি পেতে পরিবর্তিত অর্থনীতিকে ততটা গুরুত্ব দিতে চায়নি, বরং তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অরণ্যের অধিকার রক্ষায় বা বহিরাগত শক্তির হাত থেকে অরণ্যকে বাঁচানো। মহাশ্বেতা দেবী কোনো রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট হয়ে এসব

রচনা করেননি। আর তার ফলেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় পরিশুদ্ধ ও পরিস্নাত, তারা বাম-দক্ষিণ, শোধনবাদ-নয়া শোধনবাদ ইত্যাদির গোলকধাঁধায় দিশাহারা হতে চায়নি, তারা সকল প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শ ত্যাগ করেছে, আর তার ফলে সেই চরিত্রগুলোকে পরবর্তীকালে সমালোচকদের কাছে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বিবর্জিত, আবেগসর্বস্ব চরিত্র বলে মনে হয়েছে।

পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কথাকার প্রফুল্ল রায় রচনা করেছেন 'পূর্বপার্বতী' (১৯৫৬)। এটি যদিও তারাশঙ্করের 'কালিন্দী'-র উত্তরকালে লেখা, তবুও তাঁর বহুখ্যাত 'অরণ্যবহ্নি'(১৯৬৬) লেখা হয়েছে 'পূর্বপার্বতী' লেখার অনেক পরে। তাই, বাংলা আদিবাসীসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে 'পূর্বপার্বতী' একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মূলত, উপন্যাসটিতে নাগা উপজাতীয় গোষ্ঠীসমূহের বসতভূমি, পার্বত্য-অরণ্যভূমির বিবরণ, তাদের জীবিকা, ধর্ম-দেবতা, সংস্কার-প্রথা, প্রেম-বিবাহ, সর্বোপরি তীব্র 'প্যাশান' চালিত একরোখা মনোভাব, ঔপনেবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাচীন বিনিময় অর্থনীতি থেকে নাগারা কিভাবে পরিবর্তিত অর্থনীতির দাসত্ব করে, প্রাচীন ধ্যান ধারণা থেকে সরে আসে, খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়- এসব বিষয়গুলি লেখক নিজের অভিজ্ঞতায় ও তার লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। নারায়ণ সান্যাল এর 'দণ্ডক শবরী' (১৯৬২)-তে মারিয়া-মুরিয়াদের 'ঘটুল' এর পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে নাগাদের মতোই মাড়িয়াদের ঘটুল-এ মেয়েদের রাত্রিযাপনের অনুমতি নেই, অবশ্য দিনের বেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। অন্যদিকে, মুড়িয়াদের ক্ষেত্রে এধরনের বিধি-নিষেধ নেই, তার ফলে মুরিয়াদের ঘটুল-এ মুরিয়া ছেলে-মেয়ে ঠিক করে নেয় তাদের ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীকে।

‘পূর্বপার্বতী’ উপন্যাসের ঠিক পরবর্তী সময়ে লেখা হয় ‘অরণ্য আদিম’(১৯৫৭), এটি রমাপদ চৌধুরীর আদিবাসী সম্পর্কিত প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি জুয়াং, বিরহড়, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি আদিজনজাতিগোষ্ঠীর জীবনকে অসাধারণ নৈপুন্যে তুলে ধরেছেন। ‘খাজনা’ বা ‘মালগুজারি’ সম্পর্কে মুন্ডারা আদৌ পরিচিত নয়, তাদের বিশ্বাস তারা ‘সিঞবোঙা’, ‘বুড়াবুড়ি’ প্রদত্ত মাটি-জলে চাষাবাদ করে, আর তাই ‘খাজনা’ বা ‘মালগুজারি’ তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসের ওপর চরম আঘাত হানে। সভ্য মানুষের শাসন বা ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ বা ‘নতুন জাগরণ’-এর বিষয়টি এখানে লেখক উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য করে তুলেছেন।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতাল-লোহার-ভূমিজ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, বিবাহ, উৎসব, বিশ্বাস-সংস্কার, দেব-দেবী প্রভৃতির নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যায় সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’(১৯৫৮) উপন্যাসে। এই উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় উপনিবেশিকতাবাদ তথা ব্রিটিশের অমোঘ শোষণের বিরুদ্ধে বা মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বা শ্রেণিবোধ জাগরণের অভাব, যা এসবের কাছে একপ্রকার অসহায় আত্মসমর্পণেরই নামান্তর।

বাংলাকথাসাহিত্যে একালের অন্যতম বিখ্যাত লেখক সমরেশ বসু ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, সিংভূম, চাইবাসা অঞ্চলের মুণ্ডা-ওঁরাও এবং তিব্বতি-চিনা ভাষা গোষ্ঠীর লেপচা-ভুটিয়া প্রভৃতি আদিজনজাতিগোষ্ঠীর কথা পূর্ণাঙ্গ আদিবাসী সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর ‘দুই অরন্য’ (১৯৬৩), ‘মন চল বনে’(১৯৬৩), ‘বনের সঙ্গে খেলা’(১৯৭৪), ’প্রেম নামে বন’(১৯৭৫), ‘তুষার সিংহের পদতলে’(১৯৭৬) ইত্যাদি উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস, সংস্কার-প্রথা, উৎসব-পার্বণ, সৃষ্টিতত্ত্ব, রূপকথা-উপকথা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত, আদিবাসীরা

কিভাবে তাদের প্রাচীন বিনিময় অর্থনীতি থেকে পরিবর্তিত অর্থনীতির দিকে ক্রমশ অগ্রসর হল, তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অর্থনীতি কিভাবে তাদের সংকট ঘনীভূত করে তুলল ও সেই সংকট মোকাবিলায় তারা যে শোষণ বিরোধী আন্দোলন বা প্রতিরোধ গড়ে তুলল তার অত্যন্ত খুঁটিনাটি বর্ণনা সমরেশ বসুর লেখায় পাওয়া যায়।

'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরন্যের দিনরাত্রি' (১৯৬৮) উপন্যাসেও আদিবাসী সমাজের অন্য ছবি ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের মধ্যে তিনি জামশেদপুরের কাছাকাছি ধলভূম গড়ের আদিবাসী সাঁওতাল-ওঁরাওদের জীবনের বিচিত্র ছবি তুলে এনেছেন। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে আদিবাসীরা সভ্য সমাজের এত কাছে থেকেও তারা সমাজের সবদিক থেকে বঞ্চিত, শোষিত হয়েছে। তাদের আর্থনীতিক সংস্কার বা উন্নয়নের ধারা ও মধ্যবিত্ত চেতনার পরিবর্তনশীলতার বিষয়টি লেখক অসাধারণ নৈপুনণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষত, সহজ-সরল আদিবাসীদের নিরুপদ্রব, নির্মল-শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনের পাশাপাশি শহুরে মধ্যবিত্তের অবক্ষয়, চারিত্রিক অবনমন লেখককে যে কষ্ট দিয়েছে তারই নগ্ন বাস্তব, নিষ্ঠুর কাহিনি উপন্যাসটির প্রাণবস্তু।

আশি ও নব্বই এর দশকে ভ্রমণপিপাসু লেখক বুদ্ধদেব গুহ রচনা করেছেন প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান, অরণ্যচর আদিবাসী জীবনের কথা নিয়ে লিখেছেন ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। উড়িষ্যার কন্দ, বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতাল-মুণ্ডাদের জীবন তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। তাঁর 'পারিধি' (১৯৭১) এক ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস, উড়িষ্যার কন্দ আদিবাসীদের সংস্কার-বিশ্বাস, বিচিত্র সব প্রথার নানা ধরণের রোমহর্ষক কাহিনি ফুটে উঠেছে। এছাড়া 'কোয়েলের কাছে'(১৯৮০) উপন্যাসে ওঁরাও, খাঁরওয়ার, চেরোদের জীবনধারা অথবা তাঁর 'সাসানডিরি', 'শালডুংরি'(১৯৮৮) ও

‘গামহার ডুংরি’(২০০৮)-তে মুণ্ডাসমাজজীবনের অজানা তথ্যসমৃদ্ধ কাহিনির বর্ণনা পাঠককে এক অন্য জগতে পৌঁছে দেয়।

বাংলাকথাসাহিত্যের দরবারে কথাকার আব্দুল জব্বার একজন বিশিষ্ট নাম। প্রধানত টাটানগর, রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, রানীগঞ্জ, বাঁকুড়া এইসব অঞ্চলের শ্রমজীবী সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোড়া আদিজনজাতিগোষ্ঠীর দুঃসহ জীবনের বর্ণনা উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। তাঁর বিখ্যাত ‘মাতালের হাট’ (১৯৭২) উপন্যাসে তিনি আদিবাসীদের নিজস্ব আচার, সংস্কার, রীতি-নীতি বর্ণনার মাধ্যমে নিজেদের চারিত্রিক অবক্ষয়, সমাজের অবক্ষয়ের অনিবার্য ফলস্বরূপ আদিবাসীরা কীভাবে সমাজের একেবারে নীচে পৌঁছে যাচ্ছে সেটাই দেখিয়েছেন। সমসাময়িক সময়ে লেখা শক্তিপদ রাজগুরুর ভ্রমণমূলক উপন্যাস ‘বনে বনান্তরে’ (১৯৭২) প্রকাশ পায়। এই উপন্যাসের মধ্যে তিনি বিহার-উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী আরণ্যক আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা জনজাতিগোষ্ঠীর শান্ত জীবনের ছবি এঁকেছেন। আবার তাঁর লেখা ‘কিছু পলাশের নেশা’ (১৯৭৮) উপন্যাসে আদিবাসীদের অর্থনীতিক সংকট ও সংকট মুক্তির বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। মূলত, সাঁওতালরা মহাজন-ঠিকাদারদের শোষণ ও লোভী ব্যবসায়ীদের প্রতারণার শিকার। শিক্ষিত সাঁওতাল আদিবাসী সন্তান মাধো হেমব্রম সাঁওতাল সমাজকে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা বা সংস্কার থেকে মুক্ত করে সমাজের বুকে তাদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। আবার তাঁর লেখা ‘রতনমনি রিয়াং’ (১৯৭৮) উপন্যাসে ত্রিপুরার আদিজনজাতি রিয়াং সম্প্রদায়ের ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী চেতনা, তাদের দুঃসহ অর্থনিতিক সংকট এবং সংকট মুক্তির ক্ষেত্রে তাদের অনমনীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা একটি জাতির গণ-অভ্যুত্থানের ছবি ফুটে উঠেছে।

আশির দশকের একজন অন্যতম শক্তিমান কথাকার হলেন সমরেশ মজুমজার, তিনি তাঁর ‘বাসভূমি’ (১৯৮২) উপন্যাসে রাঁচি-হাজারিবাগ, চক্রধরপুর অঞ্চলের বাসভূমিচ্যুত মদেশিয়া আদিজনজাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব-বিকাশের কাহিনি ও তাদের সামাজিক ইতিহাস বা প্রবজনের ইতিকথা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। মদেশিয়ারা কীভাবে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে এসে শ্রমিকজীবনে রূপান্তরিত হয়, কীভাবে খৃস্টানধর্মে দীক্ষিত হয়, বিপর্যস্ত হয় তার নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন লেখক। এই সময়েরই আরও দুজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও দেবেশ রায়। তাঁদের লেখাতেও আদিবাসী ও নিম্নবিত্ত মানুষদের কথা উঠে এসেছে নানা ভাবে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘পঞ্চতপা’ (১৯৮৭) উপন্যাসে সাঁওতালদের নদীকেন্দ্রিক জীবনের কথা বলেছেন। মড়াই নদীর বুকে ড্যাম বানানোর জন্য তীরসংলগ্ন জমি থেকে তাদের উৎখাত করা হবে। সরকার যদিও তাদের অন্য সমস্ত খরচ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভিটেমাটি হারানোর বেদনায় তারা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনড়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার তাড়নায় তারা বাধ্য হয় ড্যাম তৈরির কাজ নিতে। লেখক মুখ্যত এখানে বাঙালি ঘেঁষা সাঁওতাল ও আরণ্যক-পার্বত্য প্রদেশের সাঁওতালদের মধ্যে মনোভাব বা প্রবৃত্তি চেতনার পার্থক্য দেখিয়েছেন। দেবেশ রায়ের মহাকাব্যসম উপন্যাস ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ (১৯৮৮)। নিম্নবিত্ত মানুষ ও আদিবাসী সমাজের ইতিহাসে এ এক অনন্য সৃষ্টি। এই উপন্যাসে মূলত নিম্নবর্ণীয় রাজবংশী ও মেচ, কোচ, রাভা, মদেশিয়া প্রভৃতি আদিজনজাতিগোষ্ঠীর জীবনধারা চিত্রিত। উত্তরবঙ্গের কৃষক-কৃষিব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত কৃষকের স্বার্থ, চা-বাগানের মালিক, ফরেস্টের জোতদার বা খাসজমির দখলদাররা কিভাবে আদিবাসীদের শোষণ করে তা নিষ্ঠাবান গবেষকের মতো চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন দেবেশ রায়। উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী, সংখ্যালঘু মুসলমান, নমশূদ্র, নানা

আদিজনজাতিগোষ্ঠীর মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছে তাদের জোটবদ্ধ আন্দোলন। তাদের দাবি অঙ্গরাজ্যের, তারা গড়ে তুলতে চেয়েছে তাদের পৃথক রাজ্য যার নাম 'কামতাপুরী'। বস্তুত, স্বাধীনতা-উত্তরকালে গণমানবের এহেন ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, স্বার্থসংশ্লিষ্ট মনোভাব বা চেতনার অভিনব চালচিত্র হয়তো বা বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতারই পরিচায়ক।

অদ্বৈতমল্লবর্মণ নিজে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন, এর ফলে তাঁর পক্ষে নিম্নবিত্তদের মানসিকতা, তাদের অবস্থান বোঝার অনেক সুবিধা ছিল, আর তার জন্যই হয়ত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিম্নবিত্তদের নিয়ে রচিত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' তাঁর হাত ধরেই এসেছে। উপন্যাসের মধ্যে তিনি তিতাস নদী তীরবর্তী মালোদের জীবন ও জীবিকার নানা ধরনের জীবনচর্যার ছবি তুলে এনেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। লেখক নিজে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি হওয়ার ফলে মালোদের জীবন অত্যন্ত সূক্ষ্ম নিক্তিতে ধরা পড়েছে, যেটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' তে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

আশির দশকে কয়েকজন অখ্যাত ঔপন্যাসিক আদিবাসী সাহিত্যের বৃত্তে বিচরণ করেছেন, যেমন- কালিপদ ঘটক, সুধাংশু বিকাশ সাহা প্রমুখ। কথাকার কালিপদ ঘটকের 'বারো বন তেরো পাহাড়' (১৯৮৪) উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবনযাত্রার কথা বা সুধাংশু বিকাশ সাহার 'বানাথাঙী' (১৯৮৪) তে কুকি সমাজব্যবস্থার অভিনব কাহিনির পরিচয় পাওয়া যায়। আদিবাসী সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এঁদের অবদান কম নয়।

উল্লেখ্য, আদিবাসী সমাজজীবন ও চেতনা সম্পর্কে যা একান্ত বাস্তব, সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হলো- আদিবাসী ও নিম্নবিত্তদের নিজেদের মধ্যে সচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি। যেদিন আদিবাসীরা তাদের জবানিতে নিজেদের সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা, অভাব-অভিযোগ, সমাজ-সংস্কার, নতুন

সমাজগঠন, তাদের আন্দোলন-প্রতিরোধ, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলবে সেদিন সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খুলে যাবে নতুন দিগন্ত। মূলত,সমতলের সভ্য, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বা অপর কোন জাতি নয়, আদিজনজাতিগোষ্ঠী নিজস্ব সাহিত্য রচনা করবে। তাদের নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত কথা সাহিত্যে নিজেদের প্রচেষ্টায় তারা পাঠকের সামনে তুলে আনবে এবং সেটাই হবে তাদের কাছে একান্ত গৌরবের। আর সেইদিন আসতে আর বেশি দেরি নেই, কারণ আদিবাসীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। আশা করতে বাধা নেই আজকের আধুনিক প্রগতিশীলতার যুগে তারাও উজ্জীবিত হয়ে রচনা করবে নিজেদের সাহিত্য। 'দুই অরণ্য'-এর লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত চরিত্রের মুখে এরকমই আশার কথা শুনিয়েছেন। সত্যি যদি কোনদিন বিপ্লব ঘটে তবে তার নেতা আদিবাসীদের মধ্যে থেকেই জন্ম নেবে।

তথ্যসূত্র

১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘আরণ্যক’, বিভূতি রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৯৮০, পৃ. ৬৩-৬৪।

দ্বিতীয় **অধ্যায়**

‘নুনবাড়ি’: নিম্নবিত্তের প্রথাবিরোধিতা ও প্রতিবাদের আখ্যান

অনিল ঘড়াই বাংলা সাহিত্যে পা রাখলেন তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস ‘নুনবাড়ি’ কে কেন্দ্র করে। প্রথম উপন্যাসেই তিনি বাঙালি পাঠক মহলকে চমকে দিলেন তাঁর কথনরীতি, গল্প বলার অভিনবত্বের দ্বারা। এতদিন পর্যন্ত পাঠক সাধারণত যেধরনের লেখা পড়তে অভ্যস্ত ছিল, হঠাৎ তারমধ্যে এল নতুনের স্বাদ। বাংলা সাহিত্যে উঠে এলেন এক নতুন লেখক, অনিল ঘড়াই।

অনিল ঘড়াই নিজে ছিলেন একজন সরকারি ইঞ্জিনিয়ার, এবং তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ। এছাড়া কর্মসূত্রে তাঁকে খড়গপুরে থাকতে হত, আর সেখানে থাকাকালীন তিনি আশপাশের অসংখ্য নিম্নবর্গের মানুষদের সাথে মিশেছিলেন। যারফলে তিনি সেইসব মানুষদের মনের একদম গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাদের আচার আচরণ, রীতি-নীতি, অভ্যাস, জীবিকা ও সর্বোপরি তাদের মনের গোপন কামনা-বাসনার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অনিল ঘড়াই এর এইসমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। ‘নুনবাড়ি’ উপন্যাসটি তাঁর সমস্ত জীবনে সঞ্চয় করা অভিজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে।

‘নুনবাড়ি’ উপন্যাসটি ১৯৮৯ সালে প্রথম প্রকাশ পায়। প্রথমদিকে উপন্যাসটি পাঠকমহলে তেমনভাবে সাড়া না ফেলতে পারলেও পরবর্তীকালে উপন্যাসটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। অনিল ঘড়াই এর পরবর্তীকালে লেখা প্রায় সমস্ত উপন্যাসের থেকে ‘নুনবাড়ি’ সম্পূর্ণ আলাদা, তার একমাত্র কারণ হল উপন্যাসটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে একজন নারীকে কেন্দ্র করে। তার নিজের

মধ্যেকার লড়াই, সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে একক-মাতৃত্বের মত সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এইসমস্ত বিষয় একজন নারীকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে আবর্তিত হয়েছে, যেটা অনিল ঘড়াই এর আর কোন উপন্যাসে সেভাবে দেখা যায়না।

অনিল ঘড়াই এই উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছেন সুন্দরবন এলাকার এক প্রত্যন্ত অঞ্চল। যেখানে মানুষ নিজের জীবিকা নির্বাহ করে নুনবাড়ি বানিয়ে। নুনবাড়ির দ্বারা সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে সংগ্রহ করে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ফুটিয়ে সেখান থেকে নুন সংগ্রহ করা হয়। আর সেই নুনকে পরবর্তীকালে গ্রামের ঠিকাদারদের কাছে বিক্রি করা হয়। এভাবেই গ্রামের প্রায় সকলে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে, আর তাই তাদের কাছে 'নুনবাড়ি' শুধুমাত্র একটা জীবিকার মাধ্যম থাকে না, হয়ে ওঠে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। সেইরকম একটি চরিত্র হল লবঙ্গ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রও সে,কাহিনীর বিন্যাসও তাকে ঘিরেই হয়েছে। অনিল ঘড়াই এই লবঙ্গ চরিত্রের মাধ্যমে একটা সমগ্র অঞ্চলের সামাজিক অবস্থান, মানসিকতা, অর্থনৈতিক অবস্থান সমস্ত কিছুই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। অল্প বয়সেই স্বামী পরিত্যক্তা লবঙ্গ, একমাত্র ছেলে নোনাইকে নিয়ে সে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসে, তার কারণ তাকে তার স্বামী ও শাশুড়ি প্রাণে মারতে চেয়েছিল। লবঙ্গর বাবা বিয়েতে মোটা পণ দিতে ব্যর্থ হয়, আর তার ফলে চলে লবঙ্গর উপর অকথ্য অত্যাচার।

"বিয়ের আগে তার বাপ জটায়ু বলেছিল, একটা বাইক কিনে দেবে জামাইকে। আজ সাত বছরেও কথা রাখতে পারেনি বাপ। কালাচাঁদের সেই রাগের শুরু। শ্বশুরমশায়ও ছেলের মুখে ঝাল খেয়ে তার সাথে কথা বলে না। দেয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, যার বাপের কথার ঠিক নেই তার মেয়ে আর কত ভাল হবে। বেলে

মাটিতে দুর্গা প্রতিমা হয় না। তাই বেলেমাটির সম্পর্ক নোনাই হওয়ার পর থেকে ঝুরঝুর ঝরে ফোঁপরা। ছানি পড়া চোখের চাউনির থেকেও ঘোলাটে।"[১]

কিন্তু লবঙ্গ হারে না, তাদের হারতে নেই। আর তাই, একদিন রাতে তার শাশুড়ি ও স্বামীর মধ্যেকার চক্রান্ত সে শুনে ফেলে। প্রাণভয়ে ভিত হয়ে সে নোনাইকে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসে। শুরু হয় তার একক মাতৃত্বের লড়াই।

অনিল ঘড়াই এখানে উপন্যাসের মধ্যে এমন এক বিষয় আনলেন, যেটা আপাত দৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও সেটিকে বাস্তবায়িত করা সোজা ছিল না। লবঙ্গ নিজের শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের কাছে আশ্রয় নিল। কিন্তু সেখানে সে বসে থাকল না, 'নুনবাড়ি' তৈরি করার কথা ভাবল। সেইসময়ে দাঁড়িয়ে একজন নারীর পক্ষে এতটা সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। লবঙ্গর নুনবাড়ি করার সিদ্ধান্তে তার বাবা জটায়ু প্রথমে খুশি হতে পারেনা।

"যেদিন থেকে নুনবাড়ির কথা উঠেছে সেদিন থেকে জটায়ু বড় গম্ভীর। মেয়ের এমন আব্দার তার মনঃপূত হয়নি।এ বাড়িতে নোনাজল ফুটলে কারো না কারোর সর্বনাশ হয়। নুন সবার ভাগ্যে সয় না, অথচ নুন সবারই দরকার, নুন না থাকলে জগৎ সংসার পানসে।"[২]

এখানে অনিল ঘড়াই নুনের সাথে মানুষের জীবনকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। 'নুন' এমন একটি জিনিস যেটা না থাকলে খাবারের স্বাদ চলে যায়, আবার অতিরিক্ত হয়ে গেলেও খাবার হয়ে পড়ে স্বাদহীন। আর ঠিক সেরকমই মানুষের জীবনও, কোনকিছুই পরিমানের চেয়ে কম বা বেশি হয়ে গেলে হয়ে পড়ে তিক্ত।

টুকরো টুকরো ঘটনার মাধ্যমে লেখক ঐ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে পাঠককে সতর্ক করেছেন। লবঙ্গের স্বামী ভাগ্যের মতই অবলারও স্বামীভাগ্য। সেও শ্বশুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত, স্বামী পরিত্যক্তা। কিন্তু সে লবঙ্গের রাস্তায় হাটেনি। কারণ তার কাছে 'টাকাই শরীরে রক্তের উৎস।' আর তাই সে সহজেই বিকিয়ে দিতে পারে নিজের শরীর। গ্রামের প্রধান নিতাই সাঁতরা তাকে নিজের রক্ষিতা বানিয়ে নেয়, নিয়মিত ভোগ করে তার শরীর। আবার তার সম্পূর্ণ অন্যদিকে আছে লবঙ্গ। গ্রামের মানুষের শত কটূ কথা শুনেও সে চুপ করে থাকে। গ্রামের মানুষ তার উপচে পড়া যৌবনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাকে নানা ধরনের কু-প্রস্তাব দেয়। এমনকি লবঙ্গের বাবা জটায়ুকেও তারা ছাড়ে না।

"কানা ঘুষো অনেক কথাই জটায়ুর কানে আসে। যত শোনে,ততই তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মেয়েকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করে। তবে, গাই-বাছুরে মিল থাকলে জঙ্গলে গিয়েও দুধ দেয়। তার কি করার আছে। প্রধানবাবুর জব্বর রাগ লবঙ্গের উপরে। সে জটায়ুকে ঠেস দিয়ে বলে, নুনবাড়ি কেন ছোট বাড়ি খুলে দিলেই পারে। মেয়ের যা রূপ তাতে ছোট বাড়ি ভালোই চলবে।"[৩]

সমাজের চাপে পড়ে জটায়ুও মাঝে মাঝে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তারও মনে হয় এই পাপ পৃথিবী থেকে লবঙ্গকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু পরক্ষনেই সে নিজেকে সামলে নেয়।

"এক সময় তার মনে হয়, এই বিষ গাছকে সমূলে উৎখাত করবে। ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে খুনি সাজতে ইচ্ছা হয়। যে মেয়েকে নিয়ে এত কটু কথার তীর নিক্ষেপ, তার জীবনদীপ নিভিয়ে দিলে কি এসে যায়? এই পাপ চিন্তা মনেই থেকে যায়, বাইরে আসে না, কাজে লাগে না।...সমাজের ভয়ে মেয়েকে নির্বাসন দেওয়া কোন আদর্শ বাপের কাজ নয়। সমাজ তার কুটিল পথ ধরে চলবে। খালধারের এই জলা গলিত সমাজকে সে মানে না। স্বামী সুখ না পেলে কি মেয়েদের সুখ ফুরিয়ে যায়? এক সুখের নটে গাছ মুড়ালে অন্য সুখের নটে-

গাছ আকড়া গতর দিয়ে বেড়ে ওঠে। এটাই নিয়ম। কেউ কখনও সবদিক থেকে নিঃস্ব হতে পারে না। এক দুয়ার বন্ধ হলে হাজার দুয়ার খুলে যায়।"[৪]

লেখক অনিল ঘড়াই উপন্যাসের এই অংশে জটায়ুর মধ্যেকার ঘটে চলা দোলাচলতার মাধ্যমে তিনি কঠোর বাস্তবের দিকে পাঠককে ঠেলে দিয়েছেন। জটায়ুর এই দোলাচলতা আসলে তার মতো আরও অসংখ্য অসহায় বাবার, তার মনের মধ্যেকার সঙ্কট তো সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্কট। আর এই ঘটনার মাধ্যমে অনিল ঘড়াই আবারও পাঠককে নিয়ে আসলেন রুক্ষ সমাজের সামনে, পাঠকের সামনে এক বিশাল প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিলেন, যার দায় পাঠক হয়ত সহজে এড়াতে পারবেনা।

কালাচাঁদ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সরাসরি সমাজের মধ্যে থাকা অশুভ শক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সমাজের মধ্যে সব ধরনের মানুষ থাকে, কেউ ভাল আবার কেউ খারাপ। একদল মানুষ থাকে যারা সবসময় সুযোগ খোঁজে নিজের স্বার্থসিদ্ধির, অপরের ক্ষতি করার। সেইরকমই একটি চরিত্র হল কালাচাঁদ। নিম্নবিত্ত মানুষ প্রায় সারাজীবনই থাকে বঞ্চিত, অবহেলিত। তাদের জীবনে প্রাপ্তির থেকে অপ্রাপ্তির ভাগই বেশি। কিন্তু তারাও চায় সমাজে উঁচু হয়ে বাঁচতে, ক্ষমতা পেতে, আর সেই জন্য অনেক সময় তারা হয়ে ওঠে মরিয়া। নিজেদের সম্মান, মূল্যবোধ সব কিছুকে বিসর্জন দেয় তারা। কালাচাঁদও সেই প্রকৃতির মানুষ। তার কাছে সম্পর্কের কোন দাম নেই, টাকা দিয়েই সে সবাইকে বিচার করে। লবঙ্গের বাবা পণ দিতে না পারায় তাই সে তাকে খুন করার পরিকল্পনা করে। লবঙ্গ তার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচে, এমনকি নিজের ছেলে নোনাইকে পর্যন্ত সে গুরুত্ব দেয় না। তার মন মজেছে তখন বড়োলোক ঘরের মেয়ের পয়সার দিকে। তার বাপের দেওয়া মোটর সাইকেলে চেপে সে তাগাদায় যায়। নিম্নবিত্তের মানুষদের এই অর্থনৈতিক পরিবর্তন

লেখক এখানে অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেন। কিন্তু সবসময় সুখের দিন যায় না, সুখের পর আসে দুঃখ। কালাচাঁদের জীবনেও ঘনিয়ে আসে অশান্তির কালো মেঘ। তার নতুন স্ত্রী তাকে সন্তান দিতে ব্যর্থ হয়। আর তখনই নিজের আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে কালাচাঁদ চিন্তিত হয়। সে বলে কয়ে নতুন বউকে রাজি করায় যে নোনাইকে সে ফিরিয়ে নেবে। আর সেই প্রয়োজনে সে ফিরে আসে লবঙ্গের কাছে। কিন্তু লবঙ্গ তার অভিসন্ধি সহজেই ধরতে পারে। লেখকের অসামান্য লেখনীর ছোঁয়ায় পাঠক সহজেই মানুষের মনের সূক্ষ্ম জটিলতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

"সে এসেছে নোনাইকে নিতে। লবঙ্গকে সে কেন নেবে? গঞ্জের বউয়ের পায়ের কড়ে আঙুলের যোগ্য নয় লবঙ্গ। তাকে নিয়ে গিয়ে সে কেন আবার অশান্তির সাগরে ঝাঁপাবে? তেমন বোকা সে নয়! গঞ্জের বউয়ের দৌলতে সে এখন মোটরসাইকেল চেপে ঘুরে বেড়ায়, ভালো জামা-কাপড় পড়ে। ভালো মন্দ খায়, সিনেমা-ভিডিও দেখে। আর তার দজ্জাল মা-টাও শহুরে বউয়ের ভয়ে নেংটি ইঁদুর। এমন সব চিরস্থায়ী সুখের খুঁটি ওপড়াতে সে যদি লবঙ্গকে নিয়ে যায় তাহলে তার মতো আহাম্মক আর কে আছে! কালাচাঁদ লবঙ্গকে নিতে আসেনি। সে এসেছে, রক্তের টানের ছেলেকে নিতে।...অথচ, শুধু নোনাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা চক্ষুলজ্জার খাতিরে শ্বশুরবাড়ি এসে বলা যায় না। ছেলে যাবে অথচ মা যাবে না, এ কেমন কথা?"[৫]

কিন্তু এসব মানুষ নিজের অভিসন্ধি যেনতেনপ্রকারেণ পূরণ করেই ছাড়ে। আর তাই, লবঙ্গর কাছে নোনাই এর ব্যাপারে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর সে সুযোগ খোঁজে। লবঙ্গের অনুপস্থিতিতে একদিন বাড়ি থেকে নোনাইকে চুরি করে নিয়ে যায়। জটায়ুর হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও সে নোনাই কে ফিরিয়ে দেয়না। লবঙ্গ হারায় তার বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন।

লবঙ্গর এই কঠিন পরিস্থিতির মাঝে মুক্ত বাতাসের মতো আসে কণ্ঠিরাম। আর এখানেই উপন্যাসটি পায় সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা। লবঙ্গ যখন স্বামী পরিত্যক্তা, শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে আসে

এমনকি নিজের শেষ অবলম্বন নোনাইও চলে যায় তখন সে নিজের জীবন যুদ্ধে একপ্রকার হারতেই বসেছিল। আর ঠিক সেই সময়ে তার জীবনে আসে কণ্ঠিরাম। সে এই গ্রামেরই ছেলে, অবিবাহিত। তার মধ্যেও লবঙ্গর জন্য একপ্রকার ভালোলাগা প্রথম থেকেই জন্মেছিল। আস্তে আস্তে সেই ভালোলাগা রূপান্তরিত হয় ভালবাসায়। মানুষের মন এক জটিল জিনিস, তাকে বোঝা বা নিয়ন্ত্রণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর তাই ভালোলাগা মানেনা জাতি, বর্ণ, ধর্ম, বয়স। নানা অছিলায় কণ্ঠিরাম লবঙ্গকে তার প্রতি তার ভাললাগার কথা বোঝানোর চেষ্টা করে।

"ঝুড়িটা দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলে ছাতাবিহীন মানুষের বড় দুর্ভোগ গো! বিনা ছাতায় রোদ-ঝড়-বৃষ্টি সামলাবে কী করে? ছাতা থাকলে সব বাবা বাছা টাইট। কেউ তার ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবেনি। তা তোমার একটা ছাতার দরকার লবং!"[৬]

কণ্ঠিরামের সাথে তার সম্পর্কটা আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব থেকে পরিণতি পায় প্রেমের দিকে। তাদের মধ্যেকার অনেক না বলা কথা, বাধো বাধো ভাব কেটে যায়, এক স্বচ্ছ জলের মতো সম্পর্ক তৈরি হয়। যে সম্পর্কের অনেকটাই 'শরীর' জুড়ে থাকলেও সেখানে আছে নির্মল প্রেম। কণ্ঠিরাম চরিত্রটিকে বাকিদের থেকে এখানেই আলাদা করে দেয়। যেখানে মানুষ শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের কথায় ভেবে যায়, অন্যের ক্ষতির কথা চিন্তা করে, সেখানে দাঁড়িয়ে কণ্ঠিরাম লবঙ্গকে ভালবেসেছে, তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে নতুন করে বাঁচার। আবার এটাও ভুললে চলবেনা যে নিম্নবিত্ত সমাজে একজন স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের সম্মান বলে কিছু থাকে। তাকে সমাজের বাকিরা নিচু চোখে দেখে, নিজেদের যৌন চাহিদা মেটানোর সামগ্রী হিসাবে কল্পনা করে। কিন্তু সেই একই সমাজে, একই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কণ্ঠিরাম শুধুমাত্র ভালোবেসেছে লবঙ্গকে। তার মনে ছিলনা কোন ধরণের পাপ। আর এখানেই কণ্ঠিরাম চরিত্রটি লেখক অনিল ঘড়াই এর লেখনীতে পায় এক নতুন মাত্রা।

লবঙ্গ চরিত্রটি অনিল ঘড়াই এর এক অনন্য সৃষ্টি। লবঙ্গ এখানে শুধুমাত্র একটি চরিত্র হয়েই থাকেনি, সে নিম্নবিত্ত সমাজের সমগ্র নারীজাতির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। অল্প বয়সেই তার বিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু সামান্য পণের জন্য তাকে তার স্বামী প্রাণে মারার চেষ্টা করে। অল্পের জন্য সে রক্ষা পায়, প্রাণ বাঁচিয়ে সে পালিয়ে আসে বাপের বাড়ি। এমনকি যতদিন সে স্বামীর সঙ্গে ছিল ততদিনও তার স্বামী তাকে গুরুত্ব দিত না, শুধুমাত্র তার শরীরটাকেই নিয়মিত ভোগ করত। কিন্তু স্বামী পরিত্যক্ত হয়েও লবঙ্গ লড়াই থামায় না, বরং এখান থেকেই তার লড়াই শুরু হয়। প্রথমেই সে ঠিক করে নেয় সে বাবার পয়সায় বসে বসে খাবে না, তার পরিবর্তে সে তৈরি করবে নিজের 'নুনবাড়ি'। সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে সে নুন বানাবে, সেই নুন ঠিকাদারের কাছে বিক্রি করবে। সমাজের লাল চোখ, পুরুষের কামনা মেশানো লালসার চোখকে উপেক্ষা করে শুরু হয় তার লড়াই। লবঙ্গ শুধু বাঁচতে চেয়েছিল, নোনাইকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু, বিধির কি বিধান! সেই নোনাই কেও তার বাবা কালাচাঁদ একপ্রকার জোর করে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু, লবঙ্গর জীবনে এরপর এল কণ্ঠিরাম। এত হতাশা, দারিদ্রতার মাঝেও লবঙ্গ নিজের শারীরিক চাহিদার কথা ভুলে যায় নি। বারবার নিজের একাকী জীবনের প্রতি জন্মেছে তার ঘৃণা, রাগ, অবসাদ। অনিল ঘড়াই বারবার লবঙ্গর একাকীত্ব, শারীরিক চাহিদার দিকটিকে পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন। নিজের ভাললাগার কথা বলতে লবঙ্গ কখনও পিছপা হয়নি। আর তাই যখন কণ্ঠিরাম লবঙ্গর শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে তখন লবঙ্গ সেটা উপভোগ করে।

"লবঙ্গ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কি ভাবছে? এদিকে যে তার বুকের শাড়ি বেসামাল- সেদিকে নজর নেই। বাঁ পাশের বাহুর উপর থেকে সরে গিয়েছে শাড়ি, মসৃণ হাতে সরীসৃপ হাওয়া পিছলে বহে যায়। হাতটা সরিয়ে শাড়িটা যে ঠিক করে নেবে তেমন উপায়ও নেই। কণ্ঠিরাম গরু চোরের মতো চোখ করে চেয়ে

আছে তার বুকে। একেবারে পাথর চোখ- নড়ে না,চড়ে না। ভালোলাগা খারাপলাগা দুধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় লাল হয়ে যায় লবঙ্গের মুখ। কেউ যে তাকে অমনভাবে দেখবে- এটা তো তার সৌভাগ্যের ফল। সব মেয়েই তো চায় পুরুষ নজর তার শরীরে কাঁচা হলুদের মতো লেপটে যাক। মেয়ে হয়ে তার এ চাওয়াতে দোষ কোথায়?"[৭]

লবঙ্গ নিজের দাবি সম্পর্কে সচেতন। আর তাই, নিজের শারীরিক চাহিদার তাগিদে সে মনে মনে তার স্বামী কালাচাঁদকে ক্ষমা করে দেয়। লেখকের অসাধারণ বর্ণনায় লবঙ্গর একাকীত্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে উপন্যাসে।

"কেমন বেহায়া, নির্লজ্জ। কি দেখছে অমন করে? মেয়েমানুষের গোপন রূপ কি পাখিতেও দেখে? ঠোঁটের কোণে একটা হাসি উঠে মিলিয়ে যায়।"[৮]

শেষ পর্যন্ত লবঙ্গর জয় হয়। সমাজের লাল চোখকে সে পরাজিত করে। নিজের প্রাপ্য মর্যাদা সে বুঝে নেয়। কণ্ঠিরামের আহ্বানে সে সাড়া দেয়। নিজেকে সে উজাড় করে দেয়। লবঙ্গর এই জয় পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রথম বিপ্লবের সূচনা। আর তাই অনিল ঘড়াই লবঙ্গর মুখ থেকে বলিয়ে নেয় কিছু চিরন্তন প্রশ্ন।

"এই প্রায় পুরুষ দলিত সমাজে পুরুষের পদস্খলন, স্বৈরাচার, অসংযম, স্বেচ্ছাচার, বিধ্বংসী জীবনযাপন যদি নির্বিবাদে সকলে মেনে নেয় তাহলে একটা অসহায় আত্মসমস্যা জর্জরিত মেয়ের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন?"[৯]

'নুনবাড়ি' কথাটা লেখক এখানে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। মানুষের জীবনের সাথে নুনকে তিনি মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন, এবং সফল হয়েছেন। তাই 'নুন' এখানে শুধুমাত্র একটি উপাদান হিসাবে থাকেনি, বরং সেটি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠেছে। নুনকে ছাড়া যেমন

খাবার স্বাদহীন, ঠিক তেমনি যৌবন ছাড়াও জীবন অর্থহীন। আর তাই, অনিল ঘড়াই বারবার উপন্যাসের মধ্যে নুন ও মানুষ কে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। বারবার নুনের প্রসঙ্গ উপন্যাসে তাই ফিরে ফিরে এসেছে-

"নুন সবার ভাগ্যে সয় না, অথচ নুন সবারই দরকার, নুন না থাকলে জগৎ সংসার পানসে।"[১০]

"মেয়েরা চিরদিনের পরগাছা নয়, গজিয়ে ওঠা উইঢিবি নয়, নোনাখালের নরম ফেনার মতো অসহায় নয়।"[১১]

"নুনের এই পলাতক স্বভাব লবঙ্গের বড় আশ্চর্য লাগে। মানুষের বিচিত্র স্বভাবের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। ঘর পালানো বউ ঝিউড়ির মতো নুন কি তাহলে কুলটা কলঙ্কিনী? নুনের এই পালিয়ে যাওয়া ধর্ম মন থেকে সে মেনে নিতে পারে না, যদিও নিজে চিকনি শাক তোলার নাম করে পালিয়ে এসেছে শ্বশুরঘর থেকে।"[১২]

"মানুষের জন্ম রহস্যের জটিল গোলকধাঁধার সঙ্গে নুনের জন্মবৃত্তান্তের কোথায় যেন সূক্ষ্ম একটা মিল আছে।"[১৩]

"এই জগৎ সংসারে যত ঘর আছে তার কোণে কোণে নুনমারা, নুন তৈরির বিশাল এক আয়োজন। এই আয়োজনের খামতি হলেই তোলপাড় হয় জগৎ-সংসার। যুদ্ধ বাঁধে, খুনোখুনি হয়। তার মনে হয়, প্রতিটি নারী-পুরুষ এক-একটা নুনবাড়ি। সর্বত্র সেখানে নোনাজলের চোরাস্রোত। বুকের আগুনে বকফুলের মতে সাদা সুগন্ধ ছড়ায় সেই দেহজ কামনা বাসনার নুন।"[১৪]

নোনাইকে হারিয়ে লবঙ্গ একপ্রকার ভেঙ্গে পড়ে। যে স্বপ্ন নিয়ে সে নুনবাড়ি তৈরি করছিল সেটা এক পলকে যেন তার চোখের সামনে নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু, অন্যদিকে লবঙ্গ ঘনিষ্ঠ হয়ে

ওঠে কণ্ঠিরামের সঙ্গে। যে সমাজ শুধুমাত্র মেয়েদের বিশেষ করে লবঙ্গকে একটা ভোগ্যবস্তু হিসাবে দেখে, নিতাই সাঁতরা লবঙ্গকে নিজের রক্ষিতা করে রাখার পরিকল্পনা করে, সেই সমাজে দাঁড়িয়ে কণ্ঠিরাম লবঙ্গকে দেয় শুধুই ভালবাসা। যেখানে নেই কোন দাবিদাওয়া, টাকা-পয়সার চাওয়া-পাওয়া। তারা শুধু নিজেদের মধ্যে নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিল। অনিল ঘড়াই এখানে নিম্নবিত্তের মধ্যে ঘটে চলা এক সঙ্কটের কথা উপস্থাপন করেছেন। সেটা হল নিম্নবিত্ত মানুষরা নিজেদের জীবনে বিরক্ত হয়ে গিয়ে নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার কথা ভাবে। সেখানে গিয়ে সামান্য কিছু কাজের সন্ধান করে আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। নিম্নবিত্তের মধ্যে একটা পলায়নবাদি চিন্তাধারা কাজ করছিল এই সময়ে। এই উপন্যাসেও ঠিক এরকমই বিষয় লেখক তুলে এনেছেন। লবঙ্গ ও কণ্ঠিরামের ঘনিষ্ঠতার কারণে লবঙ্গর গর্ভে সন্তান আসে। কিন্তু যে সমাজ একজন স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে সম্মান দেয় না, সেখানে পরপুরুষের ঔরসজাত সন্তানকে সমাজ কখনোই মেনে নেবে না। আর তাই বাধ্য হয়ে লবঙ্গ ও কণ্ঠিরাম সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা রাতের অন্ধকারে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে যাবে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত লবঙ্গর হার হয় না। সে হারতে জানে না, মুহূর্তের দুর্বলতায় নেওয়া সিদ্ধান্তকে সে ত্যাগ করে। যেখানে তার জন্ম, বেড়ে ওঠা, যেখানে তার নোনাই আছে, সাধের নুনবাড়ি আছে সেখান থেকে সে কেন পালাবে।

"লবঙ্গ বলে, নোনাখাল ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবেনি? এ গাঁয়ের ধাই বুড়ি তোমার নাড়ি কেটেচে বাঁশের পাতে তোমার- ওই দোচালা ঘরটার ভেতর- তার জন্যি তোমার কষ্ট হবেনি!"[১৫]

অনিল ঘড়াই সমস্ত উপন্যাস জুড়ে একজন নারীর ব্যর্থতার গল্পই বলে গেলেন। জীবনের প্রায় সমস্ত জায়গায় সে ব্যর্থ। কিন্তু, শেষপর্যন্ত লেখক আশাবাদের কথাই শুনিয়েছেন। জীবনের সবচেয়ে

বড় সিদ্ধান্ত নিতে যাওয়ার সময় লবঙ্গ ও কণ্ঠিরাম তাদের চাওয়া-পাওয়ার হিসাবে বসে। না পাওয়ার দিকটা ভারি থাকলেও তারা গ্রাম ছেড়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা পরাজিত সৈনিক নয়, জীবনের যুদ্ধে তারা জিতবে বলেই নেমেছে। গর্ভপাতের কথা তারা ভাবলেও শেষ পর্যন্ত এই গ্রামেই তারা নিজের সন্তানকে জন্ম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এভাবেই সমগ্র উপন্যাসে হারতে বসা লবঙ্গ জীবনের যুদ্ধে জিতে যায়। এই জয় লবঙ্গর একার নয়, বরং সমগ্র নিম্নবিত্ত সমাজের সকল অসহায় নারীর জয়। আর এখানেই এই উপন্যাস সার্থক হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শেষ অংশে লেখক নতুন সকালের, নতুন আশার কথা ধ্বনিত করেছেন। নতুন করে নুনবাড়ি নির্মাণের কথা বলেছেন, আর এখানেই পাঠকের কাছে 'নুনবাড়ি' সম্পূর্ণ নতুন মাত্রায় ধরা দেয়।

"আগামী প্রজন্মের নুনবাড়িতে হাত রেখে কণ্ঠিরাম লবঙ্গের দিকে তাকায়। মৃদু চাপ দিয়ে সচকিত করে তোলে নোনতা একটা দেহ। তারপর, আকাশ খোলা দুই বুকের মাঝে কান পেতে সে শব্দ শোনে জোয়ারের। তার মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় নুনজল দিয়ে তৈরি হয়েছে এই দেহ, নারীদেহ। নোনাজলের নুনবাড়ি সুখবাড়ি।"[১৬]

তথ্যসূত্র

১) অনিল ঘড়াই, ‘নুনবাড়ি’, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১০।

২) তদেব, পৃ. ৩০।

৩) তদেব, পৃ. ৩২।

৪) তদেব, পৃ. ৩৮-৩৫।

৫) তদেব, পৃ. ৯০।

৬) তদেব, পৃ. ৫৬।

৭) তদেব, পৃ. ৪৫-৪৬।

৮) তদেব, পৃ. ৬৪।

৯) তদেব, পৃ. ১২৮।

১০) তদেব, পৃ. ৩০।

১১) তদেব, পৃ. ৫১-৫২।

১২) তদেব, পৃ. ৬৯।

১৩) তদেব, পৃ. ৭১।

১৪) তদেব, পৃ. ১১১-১১২।

১৫) তদেব, পৃ. ১৩৪।

১৬) তদেব, পৃ. ১৩৬।

তৃতীয় অধ্যায়

‘মুকুলের গন্ধ’: নিম্নবিত্তের জীবনে প্রেম ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব

মুকুলের গন্ধ উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলায় ১৯৯৩ সালে। এই উপন্যাসটিও সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা কিছু মানুষরেই গল্প। অনিল ঘড়াই আশির দশকে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। একজন কৃতী ছোটোগল্পকার হলেও তাঁর রচিত উপন্যাসের শিল্পরূপ ছিল অভাবনীয়। উপন্যাসের সংরূপের ক্ষেত্রে কাহিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মোটামুটিভাবে ষাটের দশক থেকেই উপন্যাসে কাহিনির গুরুত্ব কমে এসে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। উপন্যাস যাত্রা শুরু করে গল্প থেকে না-গল্পের দিকে। কিন্তু অনিল ঘড়াইয়ের প্রতিটি উপন্যাসেই কোথাওই ‘না-গল্প’-এর উপস্থিতি সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। বরং তাঁর উপন্যাসগুলির প্রায় সবকটিতেই গল্প ও কাহিনির প্রাধান্য রয়েছে। তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসের মতো *মুকুলের গন্ধ* উপন্যাসেও দেখা যায় একজন সর্বজ্ঞ কথকের উপস্থিতি। সেই কথকের বয়ানে উপন্যাসের কাহিনি বিবৃত হয়। উপন্যাসটিতে চরিত্রের সংখ্যা অনেক এবং অনেকসংখ্যক চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেও এখানে কোনো একটি বা দুটি চরিত্রের প্রাধান্য দেখা যায় না। বরং সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা কিছু মানুষের সংকট আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণিত হতে দেখা যায় এই উপন্যাসে।

জগেন জমাদার ও তার পরিবার এই উপন্যাসের মূল কাহিনিটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তার পাশাপাশি তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে ঘিরে আরো কিছু মানুষের জীবনের সংকট প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকরা মনে করেন অনিল ঘড়াইয়ের লেখার মূল বিষয় দলিত ও

নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন নিয়ে হলেও কখনই দলিত জীবনের গ্লানি সেই মানুষগুলির জীবনকে কালিমালিপ্ত করেনি। সেই কারণেই এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র জগেন সরকারি হাসপাতালের জমাদার এবং সে হাজারটাকা মাইনের চাকরি করলেও আরাম ও আয়েশের মধ্যে জীবন কাটাতেই বেশি ভালোবাসে। মাংসের প্রতি আকর্ষণ তার প্রবল। তারই সঙ্গে গ্রামে রামশুঁড়ির তাড়ির ঠেকে দিনে একবার না গেলে তার চলে না। মাসের প্রথমে আনা হাজারটাকা এই মদ ও মাংসের জন্য খুব দ্রুতই নিঃশেষিত হয় এবং তখন তাকে হাত বাড়াতে হয় স্ত্রী আন্নাকালীর পরের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে আনা পঁচিশ টাকার দিকে। আন্নাকালী সেকারণে মুখঝামটা দিতেও পিছপা হয়না। মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা জগেনের মেজাজ ভীষণ কড়া। সে কারণেই তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক তিক্ততাপূর্ণ। তাদের মধ্যেকার কলহ প্রায় প্রতিদিনই একে অপরকে শারীরিক আঘাতের মাধ্যমে শেষ হয়। কিন্তু তবুও প্রাণশক্তির এই প্রতিদিনের ক্ষয় তাদের কাছে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের এই পশুবৃত্তিতে একমাত্র বিচলিত হয় অর্জুন, তাদের আঠারো থেকে সদ্য উনিশে পা দেওয়া একমাত্র সন্তান। যদিও 'সন্তান' শব্দটির মধ্যে সভ্য সমাজের মানুষের মনে থাকা যে লালিত্য ও স্নেহের বোধ থাকে সেই স্নেহ বা লালিত্যবোধ কোনোটাই অর্জুন সম্পর্কে জগেনের মনে নেই। নিম্নবিত্ত সমাজে যেখানে নিজের পেটটুকু চালাতেই মানুষকে হিমশিম খেতে হয় সেখানে সন্তান সম্পর্কে স্নেহের বোধকেও বিলাসিতা বলেই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আন্নাকালী। অর্জুনের প্রতি তার অপত্য স্নেহ। সারাদিনই সংসারের কাদায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকলেও অর্জুনের ভাবনা তার কাছে প্রাণবায়ুর মতো। অর্জুনকে খাইয়ে মাখিয়ে তবেই তার সুখ। মাতৃস্নেহ নামক বস্তুটিই এমন একটি বিষয়, যার চরিত্র সর্বদেশে-সর্বকালে সমাজের সমস্ত স্তরে, জীবনযাত্রার ভেদেও একইরকম। তাই জগেন যখন তীব্র আক্রোশে আঘাত করতে থাকে আন্নাকালীকে তখন আঘাত পেতে পেতেই তার মন ব্যস্ত থাকে অর্জুন সম্পর্কে দুর্ভাবনায়। সারাদিন অল্প খাবার খেয়ে মাঠে মাঠে শুয়োরের

পাল চরানো অর্জুনের খিদের কথা ভেবে তার মন ব্যাকুল হয়ে থাকে। তাদের প্রতিদিনের ঝগড়ায় যে অর্জুন বিরক্ত হয় এবং আন্নাকালীর উপর জগেনের হাত তোলাকে যে সে ঘৃণার চোখে দেখে তা আন্নাকালী জানে। তাই অর্জুনকে তোয়াক্কা না করেই যখন জগেন তীব্র আক্রোশে আন্নাকালীর উপর চড়াও হয় তখন সে অর্জুনের কথা ভেবে যারপরনাই লজ্জিত হয়। অন্যদিকে নেশার ঘোরে প্রায়শই রাতে দিগ্বিবিদিক জ্ঞানশূন্য জগেন আন্নাকালীর শরীরকে শুষে নিতে উদ্দাম যৌনমিলনে মত্ত হয় অর্জুনের সামনেই। সেই নিরুপায় মুহূর্তে অসহায় আন্নাকালীর লজ্জায় চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

অন্যদিকে অর্জুন যে শুয়োরের পাল চরাতে যায় সেই পালের মালিক তার বাবা। সেই পালের খিচড়া শুয়োরটি যেন জগেনেরই প্রতীক। জগেনের মতোই সে অত্যন্ত ধূর্ত। তার মাথা কুবুদ্ধিতে ভরা। ঠিক যেমনটা জগেনের-

> ''লোক যাই বলুক, বোকা নয় জগেন জমাদার। সেয়ানা কথাটা তার বেলায় খাটে।...জগেনের স্বভাব শেয়াল নয় কিছুটা বর্ণচোরা গিরগিটির মতন। রঙ বদলাতে তার জুড়ি মেলা ভার। যারা রঙ বদলায় তারা ক্ষণে ক্ষণে স্বর বদলায়। যেমন খিচড়া শুয়োরটা!''[১]

যেরকম করে খিচড়া শুয়োরটা দলের বাকি শুয়োরদের বাঁচতে দেয় না, সর্বত্র নিজের কর্তৃত্ব ফলিয়ে বাকিদের জীবনকে কঠিন করে তোলে ঠিক সেরকমই জগেন তার স্ত্রী ও পুত্রের জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে। সে স্বার্থপর। নিজের স্বার্থের প্রশ্নে সম্পর্কের মূল্য তার কাছে নস্যির মতো। তার পাশাপাশি সে নিজেকে ছাড়া সংসারের আর কাউকে নিয়েই ভাবিত নয়। তার স্ত্রী আন্নাকালী তার কাছে 'জলঢালা ভাত'। তাই মাদী শুয়োরকে গর্ভবতী করার পরেও যেরকম খিচড়া শুয়োর তাকে সহজেই উপেক্ষা করে যায়, এখানেও ঠিক সেরকম মাদী শুয়োরের বেদনার বোধের রূপক ব্যবহার করে লেখক চমৎকার ভাবে জগেন ও আন্নাকালীর

দাম্পত্য সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলেন। জগেনের সঙ্গে তার ছেলে অর্জুনের সম্পর্কও সহজ নয় মোটেও। তাদের দুজনের একে অপরের দিকে চাহনি যেন 'ছেনি ও লোহার ঠোকাঠুকি হওয়ার মতন', 'বাপ-ছেলের সম্পর্কটা এখন পচা সুতোয় বাঁধা, যে কোনোদিন ছিঁড়ে যাবে পুট করে।' কিন্তু তাদের সম্পর্কের আসল চেহারা পুরোপুরি এরকম নয়। জগেন তার ছেলেকে নিয়ে চিন্তিত কিন্তু পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের যে চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বীতা সেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয় প্রত্যহ। জগেন তার ছেলেকে পড়াশুনো শেখাতে চাইলেও মাত্র চার ক্লাস পর্যন্ত পড়েই পড়াশুনো সাঙ্গ করেছে সে। সে কারণেই তার প্রতি জগেনের ক্ষোভ। অন্যদিকে জগেন নিজের মদ-মাংসের তৃষ্ণা মেটাতে প্রায়ই বিভিন্ন মহাজনের কাছে টাকা ধার নেয়। সেই মহাজনেরা টাকা আদায়ের জন্য এসে টাকা না পেয়ে জগেন ও তার পরিবারকে যারপরনাই অপমান করে। অর্জুনের আত্মসম্মানবোধ প্রবল। জগেনের মতো সে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত নয়। তাই একদিন যখন হাড়ের মহাজন টাকা চাইতে আসে তখন অর্জুনের সঙ্গে তার বাপের ঝামেলা চরমে পৌঁছায়। পরদিন সকালেও যার রেশ থেকে যায়-

"জগেন জমাদার হার মানার লোক নয়, সে রাবণ চোখে তাকাল। অর্জুন বা কম কিসে? তার দৃষ্টিতে রাবণ বধের প্রতিজ্ঞা।"[২]

এই হল তাদের প্রতিদিনের জীবনের ছবি।

'শীতশেষের হলুদ পাতা' আন্নাকালী, প্রবৃত্তিচালিত জগেন ও বাপের ছায়ার বাইরে গিয়ে ডালপালা মেলতে চাওয়া অর্জুন- এরা প্রত্যেকে নিজের নিজের জীবন নিয়ে অতৃপ্ত। মনের মতো জীবনের জন্য তাদের অপরিসীম তৃষ্ণা। জগেন তাই 'তোপড়া অশৌচ হাঁড়ি' আন্নাকালীকে ছেড়ে স্বপ্ন দেখে হাঁড়ি পাড়ার বিধবা যশোদাকে নিয়ে নতুন ঘর বাঁধার; অর্জুন শুয়োরের পাল খেদাতে গিয়ে ঝিমধরা দুপুরে গাছের তলায় বসে নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করে

ও তিক্ত জীবন ত্যাগ করে স্বপ্ন দেখে স্বাবলম্বী হওয়ার; আর আন্নাকালীর জগৎ জুড়ে থাকে টিয়া ও অর্জুনের একসঙ্গে ঘর বাঁধতে দেখার স্বপ্ন। তাই নিজের অসুখী জীবন নিয়ে জগেন জমাদারের ভাবনাই হয়ে ওঠে এদের সকলের জীবনের পরিচায়ক-

"জীবন যদি উপভোগের না হয় সে জীবন কি জীবন নাকি? নদী-স্রোত হারালে নদী যেমন নদী নয় তেমন জীবন থেকে মৌজ হারালে আখকলে পেষাই ছিবড়ে ছাড়া আর কিছু নয়।"[৩]

এদের জীবনে একঘেয়েমি আছে কিন্তু তা নিস্তরঙ্গ কখনই নয়। তাদের কলহময় পশুজীবন জীবন্ত হয়ে ওঠে লেখকের অপূর্ব চিত্রকল্পের ব্যবহারের মাধ্যমে। জগেন, অর্জুন বা আন্নাকালীর মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলতে উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত ইন্দ্রিয়মূলক চিত্রকল্পগুলি তাদের আচরণকে প্রাণময় করে তোলে পাঠকের কাছে।

অন্ত্যজ সমাজের খুঁটিনাটি অনিল ঘড়াইয়ের কলমে উঠে এসেছে চমৎকারভাবে। তিনি নিজে ছিলেন হাড়ি সমাজেরই লোক, অন্ত্যজ এবং অবশ্যই ব্রাত্য। সমাজে আলাদা হয়ে থাকার যন্ত্রণা তিনি বুঝেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে। যে জীবন তিনি নিজে যাপন করেছেন তাঁর চরিত্ররা সেই জীবনেরই লোক তাই নিম্নবৃত্তের আচরণ ও মনস্তত্ত্ব তাঁর লেখায় অত্যন্ত সজীব। তিনি নিজে যেরকম সমাজের নীচু স্তর থেকে উঠে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, নিজের পরিচয়কে না ভুলেই। ঠিক তেমনভাবেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরাও চায় উত্তরণ। সেই কারণেই জগেন জমাদারের মতো লোকের আচরণকে শুয়োরের সঙ্গে তুলনা করলেও তার ছেলে অর্জুন সেই পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চায় না। তার চোখে এই পশুগুলোও তার চারপাশে দেখা মানুষগুলোর মতোই এক একটা 'সমস্যাবাহী জাহাজ'। যারা 'পেট আর স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না' এবং তার বাবাও ঠিক এই গোত্রেরই। সে ক্ষমাহীন পুরুষ। তার মনে দয়া-মায়া নামক অনুভূতিটি বিরল। সে ক্রোধান্ধও বটে। রেগে গেলে তার চোখ পরিণত হয় পাথরে, সেই

পাথুরে চোখ থেকে তখন ঠিকরে পড়ে আগুন। সেই আগুনে আন্নাকালী জ্বলে পুড়ে মরে অহর্নিশ। অথচ কঠিন বাস্তব তার অজানা নয়। সে জানে তাদের অভাবের জীবন মূল্যহীন। তাদের বেঁচে থাকা এই সমাজে পশুর মতো বেঁচে থাকারই নামান্তর। সে জীবনের মূল্য পথের ধুলোরই মতো, কারোর গায়ে লেপ্টে তবেই সে জীবন সার্থকতা পায়। আর অন্ত্যজ জীবনে 'সার্থকতা' নামক শব্দের কোনো অস্তিত্বই নেই! সে জীবন শুধু দিনের পর দিন কাটিয়ে টিকে থাকার লড়াই। যে লড়াই এই উপন্যাসে লড়েছে অর্জুনের প্রেমিকা টিয়া। অল্প বয়সে তার মা মারা যাওয়ায় তার ভাইবোনদের দেখভালের জন্য তার বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। অথচ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তার নতুন মা বেশকিছু সন্তানের জন্ম দিয়েছে। ফলে তাদের অভাবের সংসারের বোঝা দিনের পর দিন আরো ভারি হয়েছে। সেই বোঝা বওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে অল্পবয়সী টিয়া। সরকারি হাসপাতালের বাসন মেজে যে বুলগার হুইটের খিচুড়ি সে বাড়িতে নিয়ে আসে সেই খিচুড়িই তার ভাইবোনের কাছে অমৃতের মতো। তাদের সস্তার বুলগার হুইট খেয়ে কাটানো জীবনে ভাত বিলাসিতার দ্রব্য। তাই সামান্য খিচুড়ির জন্য কাজ করতে গিয়েও যখন হাসপাতালের রাঁধুনি প্রতিদিন তার কুঁড়ির মতো যৌবনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তাকে চোখ দিয়ে লেহন করে এবং তার নিকৃষ্ট চাহনি দিয়ে তাকে ধর্ষণ করে প্রত্যহ তখনও অসহায় টিয়া প্রতিবাদ করতে পারে না। কারণ অতিরিক্ত দুহাতা খিচুড়ি পেলে তার ভাইবোনেরা পেট ভরে খেয়ে ঘুমোতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে সম্ভ্রম বাঁচানোর চেয়েও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পেট চালানোর লড়াই। তার কঠিন জীবনে একমাত্র নিরাপত্তা অর্জুন। অর্জুনকে টিয়া ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার ভরসাতেই হাসিমুখে লড়াই করে চলে টিয়া জীবনের বিরুদ্ধে। সে একটা স্বপ্ন নিয়েই বাঁচে। সে স্বপ্ন হল পরিবারের পেটে দুবেলা অন্নের সংস্থান এবং অর্জুনের সঙ্গে তার সুখের সংসার। তার সৎমায়ের এই জীবনের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা। তাই কারখানার বাবুর ঘরে গিয়ে শরীরের বিনিময়ে সুখী জীবনকে কিনতে

চায় সে। ঘরে তার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, সোমত্ত মেয়ে টিয়া এবং বৃদ্ধ স্বামী। কিন্তু তাদের প্রত্যেককে উপেক্ষা করেই সে কারখানার বাবুর কাছেই নিজেকে বিকিয়ে দেয় প্রতিরাতে। এমনকী টিয়া তাকে নিষেধ করলেও সে উল্টে টিয়াকেই পরামর্শ দেয় তার পথে হাঁটতে। কিন্তু টিয়া ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তার প্রস্তাব। তার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রবল। শত অভাবের মধ্যেও তাই সে চরিত্রকে ভেসে যেতে দেয় না। এমনকী তার বিয়ের সম্বন্ধের কথা জানতে পেরে চরম আক্রোশে অর্জুনের মনেও যখন জেগে ওঠে পশুবৃত্তি এবং সে টিয়াকে ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে জুড়িয়ে নিতে চায় শরীর ও মনের জ্বালা, তখনও টিয়া অর্জুনের এই আচরণে আহত হয় এবং অর্জুনের উপর বর্ষণ করে তীব্র ঘৃণা। অর্জুন তার প্রেমিক হলেও তার চরিত্রে মনুষ্যত্বকে ছাপিয়ে প্রবৃত্তি প্রধান হয়ে উঠতে চাইলে এভাবেই টিয়া তাকে প্রতিহত করে। টিয়া ও তার সৎমা একই স্তরে অবস্থান করলেও তাদের চরিত্রে এভাবেই দেখা যায় বৈপরীত্য। তারা সমতলে অবস্থান করলেও তাদের পথের অভিমুখ যে কতটা আলাদা তা এভাবেই বুঝিয়ে দেন লেখক। তারা প্রত্যেকেই অসহায় এবং নিজ নিজ অবস্থানে তারা প্রত্যেকেই সঠিক। সর্বোপরি তারা রক্ত মাংসের মানুষ। তারা তাই দোষগুণ দুয়েরই সমাহার। লেখকের কাছ থেকে দেখা অন্ত্যজ জীবন ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি এভাবেই চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

অর্জুন এই পাঁকে পূর্ণ জীবনের মানুষ হলেও তার নিজস্ব একটা জগত আছে। সে জগতে তার বাবার সঙ্গে মনেমনে লড়াইয়ে সে রোজ জিতে যায় এবং তার মা সেখানে পড়ে পড়ে মার খায় না। শুয়োরের পাল নিয়ে অনেকদূর চলে গেলে তার মন কেমন করে মায়ের জন্য। মায়ের মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্য তার চেষ্টার অন্ত নেই। সে চায় বাবার চোখের আড়ালে গিয়ে শহরে চাকরি করতে। সে জানে একমাত্র সেই পথেই সে এই গ্লানিময় জীবন থেকে একদিন মুক্তি পাবে, তার মাকে সুখী করতে পারবে। তাই তার প্রিয়বন্ধু মাধবের সঙ্গে সে নানান পরামর্শ করে শহরে যাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু তার বর্তমান জীবন সহজে তার পিছু ছাড়ে না।

তার স্বপ্ন দেখাই সার হয়, তা কোনোদিনই বাস্তবায়িত হয় না। তার জীবনও তাকে অন্যকিছুই দেয় না, দেয় শুধু ক্লান্তি। কিন্তু তারপরেও অর্জুনের একটা মন আছে, দেখার চোখ আছে। যে চোখে সারাদুপুর না খেয়ে পাল খেদালেও সূর্যাস্তের দৃশ্য অপূর্ব মহিমায় ধরা দেয়। সে দেখে-

"বিকেলের এই সময়টাতে রোদরা বড় মনমরা; ঝিমন্ত পাপড়ির মত মলিন, নিষ্প্রভ। লাটাইয়ের সুতো গোটানোর মত দুরন্ত, দামাল। বেয়াড়া রোদ্দুলোকে তাড়িয়ে কে যেন নিয়ে যায় পশ্চিমের ঐ কোলটাতে। সূর্যের রক্ত মুখ পশ্চিমে তখন রঙ ছড়ায়। বাঁধের উপর দিয়ে চেরা ক্ষুরে ধুলোর ঝড় তুলে পিলপিল করে হেঁটে যায় সারিবদ্ধ গোরুগুলো।"[৪]

- অর্জুনের এই দেখার চোখ তার কলুষতাহীন মনেরই পরিচায়ক। তার এই চোখ যেন শিল্পীর চোখ যে চোখ সূর্যাস্তকে আরো মোহময় করে তোলে এবং অর্জুনের বয়ানে লেখকের এই বর্ণনা তাঁর মধ্যেকার কবিসত্তাকেই ফুটিয়ে তোলে। গোটা উপন্যাস জুড়ে প্রতিটি চরিত্রের অপূর্ণ জীবনের বিপরীতে লেখক এভাবেই এঁকে চলেন নানান টুকরো টুকরো কাব্যময় ছবি। অন্ত্যজ হলেও তাদের জীবনেও শিল্প আছে এবং দেখার চোখ যে শুধুমাত্র উপরতলায় থাকা মানুষের একার অধিকারের নয় তার উদাহরণ হয়ে ওঠে অর্জুন। সেই শিল্পী মনটির সঙ্গেই তার বাস্তববোধও অত্যন্ত প্রখর। তাই ফিঙের ফড়িং ধরার দৃশ্যে সে মজা পেলেও পরক্ষণেই সেই দৃশ্য তাকে মনে করায় তার মা ও বাবার দাম্পত্য সম্পর্কের কথা, যে সম্পর্কে পারস্পারিক সম্মান তো নেইই বরং যা অনেকটাই এই ফিঙে ও ফড়িং-এর শিকার ও শিকারীর সম্পর্কের মতোই; এই দৃশ্যে তীব্র ব্যথায় বিষিয়ে ওঠে তার বুক। তখনই মায়ের কথা মনে পড়ে যায় তার- 'তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস অর্জুন---তুই না থাকলে ঘর আমার কাছে শুনশান ভাগাড়।' তার মনে প্রশ্ন জাগে- 'তবে কি ভয় পায়? কিসের ভয়? মানুষের ভয় তো শুধু মৃত্যুকে, অপমান আর যন্ত্রণাকে।' এই বর্গের মানুষগুলির আসলে জীবনের কাছে কিছুই চাওয়ার থাকে না এবং ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এদের খোয়ানোরও কিছুই থাকে না। তাই মৃত্যু ছাড়া জীবনের আর

কোনো বীভৎসতাকেই তারা ভয় পায় না। তারপরেও আন্নাকালীর মধ্যে অনিশ্চয়তার বোধ দেখে অর্জুন অবাক হয়। সেইসঙ্গেই লেখক পাঠকের মনে একটি প্রশ্নকে খুঁচিয়ে তোলেন, তবে কী মানুষের এতদিনের যে চর্চা প্রমাণ করে অন্ত্যজ জীবনে শূন্যতা ও মৃত্যুভয় ছাড়া অন্য কোনোকিছুই সত্য নয়, সেই চর্চা আসলে ভ্রান্ত? সমাজের বাকি মানুষের মতোই তারাও তবে জীবন-মৃত্যুর গন্ডির বাইরেও নিরাপত্তা চায়, আশ্রয় খোঁজে, শক্ত একটা কাঁধ চায় এবং তাদের সেই খোঁজ উঁচুতলার মানুষের শৌখিনতায় মোড়া জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ার মতো নয়, বরং সেই খোঁজ জীবনের কঠিনতম পরিস্থিতির মধ্যে বাস করেও তা থেকে পালিয়ে না গিয়ে, অপমান ও যন্ত্রণাকে মেনে নিয়েই বেঁচে থাকা, বদ্ধ ঘুপচি ঘরের পাথুরে দেওয়ালে প্রিয়জনকে আঁকড়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো একটা ঘুলঘুলি নির্মাণ করে নেওয়া।

মুকুলের গন্ধ উপন্যাসটিতে সমাজের নীচের স্তরের মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি উঠে এলেও, এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এই মানুষগুলির জীবনে আসা প্রেম। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা গেছে জগেন জমাদারের আন্নাকালীর প্রতি বিতৃষ্ণার মূল কারণ হাড়িপাড়ার বিধবা যশোদার প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ। এই উপন্যাসে জগেন জমাদার চরিত্রটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। জগেন জমাদারের জীবনযাপনে প্রধান হল প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে গিয়ে সে নির্দ্বিধায় অসৎকাজেও লিপ্ত হতে পারে। সেই কারণেই টাকার জন্য সে চুরি করে হাসপাতালের ব্লিচিং পাউডার লুকিয়ে বিক্রি করে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করা ও ইন্দ্রিয়সুখই তার একমাত্র কাম্য। সেই কারণেই টাকার লোভে সে অমানবিক আচরণ করতেও পিছপা হয়না। তাই দূর গ্রামে আত্মহত্যায় মৃত বধূকে নিয়ে তার স্বামী হাসপাতালে এলে তাকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে সে টাকা আদায় করে। এমনকী বধূটির শবদেহ থেকে নাকছাবি খুলে নিয়ে পকেটে ভরতেও তার হাত কাঁপে না। বধূর স্বামীটি তাকে এই কাজ করতে নিষেধ করলে সে পিশাচের মতো হাসতে থাকে। জগেন প্রকৃতই নরপিশাচ। তার পূর্বপুরুষেরা ছিল

ডাকাত। তাঁদের নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। হিংস্রতা তার রক্তে। তাঁদের মতোই জগেন দুঃসাহসী। মনুষ্যত্ববোধের ছিঁটেফোঁটাও তার মধ্যে নেই। সেইকারণেই চক্ষুলজ্জাহীন জগেন যশোদাকে সরাসরি তার অনুভূতির কথা জানিয়ে দেয়। এতে যশোদা লজ্জিত হলেও তার মনে কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না। অন্যদিকে যশোদা বিধবা হলেও আত্মসম্মানবোধ তার অতি প্রবল। সে অসহায়, তার চার পাঁচ বছরের ছেলে রাখালকে সে পেট ভরে খেতে দিতে পারে না। এমতাবস্থাতেও কিন্তু জগেন তাকে সুখী নিশ্চিন্ত জীবনের প্রলোভন দেখালেও সে তার কথায় কান দেয় না। বরং তীব্র ঘৃণার সঙ্গে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রথম জগেন যা চায় তা পেতে সে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। ফলে তার মধ্যেকার জান্তবসত্তাটি আরো ফুঁসে ওঠে। সে হয়ে পড়ে দ্বিগুণ হিংস্র। প্রত্যাখ্যাত হয়ে যশোদা যাকে সে ভালোবাসে তাকেও আঘাত করতে ছাড়ে না। অন্যদিকে স্বার্থে অন্ধ হয়ে সে নিজের স্ত্রী পুত্র বা সমাজের বাকি লোকেদের কথা চিন্তাও করে না। আর এরই বিপরীতে আন্নাকালী জগেনের এই ব্যভিচারী আচরণের কথা জানতে পেরেও নিশ্চুপ থাকে। এমনকী জগেনকে সুখী করতে সে যশোদাকে বিয়ে করে ঘরে আনার প্রস্তাবও দেয়। সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে জগেনের সুখের জন্য সে ঘর ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত। অন্যদিকে যশোদাকে উত্যক্ত করার কথা অর্জুনকে জানায় যশোদা নিজেই। সহায়সম্বলহীন বিধবা হলেও সে যে জগেনের এই অভব্য আচরণে বিপন্ন বোধ করছে এবং সমাজে তার দুর্নাম হলে তার বেঁচে থাকা আরো কঠিন হয়ে পড়বে তা অর্জুনকে জানায় যশোদা। অর্জুন এই ঘটনা জানতে পেরে চরম রেগে যায়। পিতার প্রতি ঘৃণায় তার গা গুলিয়ে ওঠে। তার মায়ের প্রতি এই অবিচার এবং গ্রামের সকলের কাছে এভাবে মাথা হেঁট করে দেওয়া অর্জুন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে তার মনে। এভাবেই লেখক পিতা ও পুত্রের মধ্যেকার আদিম প্রতদ্বন্দ্বীতার মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলেন। পিতার পিশাচ রক্ত নিজের শিরায় বয়ে নিয়ে চললেও অর্জুন

পিতার মতো পশুবৃত্তি অবলম্বন করতে তো পারেই না, বরং নিজের বাবার আচরণে অসম্ভব বিবমিষায় ভরে ওঠে তার মন। যশোদা মাসির অসহায়তা তাকে ব্যথিত করে। যশোদাকে সাহস জোগাতে রাখালের মতোই সেও যশোদার পাশেই তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। সে উনিশ বছরের এক যুবক হলেও এবং সমাজের চোখে তা অস্বাভাবিক হলেও, তার সেই আচরণ একেবারেই কামগন্ধহীন। পিতার অমানবিক স্বার্থপর আচরণের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে অসহায় অর্জুন মুখ লুকোয় যশোদার শতচ্ছিন্ন আঁচলের আড়ালে। এ যেন এক মাকে সান্ত্বনা ও ন্যায়বিচার দিতে না পারার যন্ত্রণায় আর মায়ের বুকে মুখ লুকানো। এভাবেই অনিল ঘড়াই পাঠকের সামনে হাজির করেন এক স্বপ্নিল সমাজব্যবস্থার ধারণার। যে সমাজব্যবস্থায় স্বার্থপরতা, অন্ধপ্রবৃত্তির জায়গা নেই। জগেনের মতো মানুষ যেখানে অন্ধ প্রবৃত্তির হাতে ধরাশায়ী হয় না।

এহেন অর্জুন বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে একদিন বাড়ি ছেড়ে শহরে যাওয়ার সংকল্প নেয়। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে জলের খোঁজ করতে গিয়ে তার সঙ্গে হঠাৎই আলাপ হয় বাসমতী নামের একটি মেয়ে এবং তার বাবার সঙ্গে। তারা গ্রাম থেকে দূরে একটি বাঁশবনের মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়। বাসমতী পরমা সুন্দরী। তার বাবা পেশায় গুণিন। কিন্তু গ্রামবাসীর চোখে বাসমতী ডাইনি। তাই তারা একঘরে হয়ে জঙ্গলের মধ্যে নিঃসহায় জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। অর্জুন বাসমতীর রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়। এরপরই উপন্যাসে শুরু হয়ে আরেক নতুন আখ্যান, নিম্নবিত্ত জীবনের আরেক অন্ধকারের গল্প। তা হল অন্ধবিশ্বাস। বাসমতী ও তার বাবা সাপ ধরতে পারে বা সাপের বিষ তুলে মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে ঠিকই কিন্তু বাসমতী কখনোই কারোর রক্ত চুষে কাউকে খুন করতে পারে না। অথচ এই বিশ্বাসেই গ্রামবাসীরা তাদের জঙ্গলের মধ্যে অসহায় জীবনযাপনে বাধ্য করে। অর্জুন তাদের জীবনের এই একাকীত্বে দুঃখ অনুভব করে। তারপর সে বাড়ি ফিরে গেলেও মাঝেমাঝেই বাসমতীর

কাছে আসতে শুরু করে। এরপর একদিন বাসমতীর বাবার কাছে সে শোনে বাসমতীর মায়ের বিখ্যাত গুণিন হয়ে ওঠা এবং তারপর একদিন গ্রামবাসীর হাতেই ডাইনি অপবাদে নৃশংসভাবে পুড়ে মরার কাহিনি। এই ঘটনার অভিঘাতেই তাদের বেঁচে থাকা কীভাবে অসহনীয় হয়ে ওঠে তাও শোনে অর্জুন। তাদের প্রতি মায়ায় তার মন পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর সে মন্ত্র নিতে চাইলে বাসমতী তাকে মন্ত্র দিতে চায় এবং জ্যোৎস্না রাতে তারা জঙ্গলে যায় মন্ত্রের জন্য। সেখানে মন্ত্র পড়ে বাসমতী আকাশ থেকে বৃষ্টি নামানোর কথা বলে অর্জুনকে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাসমতী মন্ত্র পড়লেও মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে না। কিন্তু দেহের ক্ষুধায় চাঁদের দিকে চেয়ে থাকা বাসমতীর শরীর উত্তপ্ত হয়। প্রেমের স্বাদ না জানা বাসমতী অর্জুনের শরীরের উত্তাপের দ্বারা নিজেকে জুড়িয়ে নিতে চায়। কিন্তু অর্জুন তার ডাকে সাড়া দেয় না। সে প্রত্যাখান করে বাসমতীকে। বাসমতীকে অতৃপ্ত রেখেই তার নগ্ন শরীরের অপূর্ব সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে অর্জুন। তার মনে কাজ করে এক অদ্ভুত দোলাচলতা। সে বাসমতীর প্রতি আকৃষ্ট কিন্তু টিয়ার প্রতিও দায়বদ্ধ। তাই টিয়ার সঙ্গে প্রতারণা সে করতে পারে না। অন্যদিকে বাসমতী চিরকালই অতৃপ্ত, দেহের ক্ষুধা তাকে অধীর করে তোলে। সেই কারণেই চাঁদের আলোয় নগ্ন শরীর মেলে ধরে সে তৃষ্ণা নিবারণ করতে চায় অর্জুনের মাধ্যমে। এই জায়গাতেই অর্জুনের সঙ্গে তার বাবার পার্থক্য তৈরি করে দেন লেখক। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যে রক্তের নেশাকে জগেন অতিক্রম করতে পারে না, অর্জুন সেই রক্তের নেশার অভিশাপকে কাটিয়ে ওঠে। তার ও টিয়ার প্রেমের মুকুলকে বেড়ে ওঠার জন্য নিরাপত্তা দিতে বাসমতীর জীবনে প্রেমের মুকুলকে সে ফুটতে দেয় না। অন্যদিকে জগেন-আন্নাকালী-যশোদার জীবনেও যন্ত্রণা এনে দেয় সমাজের চোখে অস্বাভাবিক ত্রিকোণ প্রেমের মুকুলই। এই জায়গায় এসে অনিল ঘড়াই সমাজের চিরকালীন সমস্যার দিকটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। জগেন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের দিকে পা বাড়ায় ঠিকই এবং তার কারণে আন্নাকালীর জীবনে নেমে আসে অন্ধকার তাও সত্য। কিন্তু

সমাজের চিরাচরিত প্রথার বাইরে গিয়ে জগেন যে তার পছন্দের মানুষের সঙ্গ পেতে চায় তাও ঠিক ততটাই সত্য এবং এই সত্যের বশেই সে সমাজে চলে আসা প্রাচীন প্রথাটিকে অস্বীকার করে। সে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিবাহ নামক গৌরবোজ্জ্বল সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে, যে প্রতিষ্ঠানের কারণে একের অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান না থাকলেও সারাজীবন সেই সম্পর্কটিকে বয়ে বেড়াতে হয় স্বামী-স্ত্রীকে। অন্যদিকে আন্নাকালী তীব্র সংকটের সম্মুখীন হলেও সেও তাদের সম্পর্কের এই প্রেমহীনতার বাস্তবকে স্বীকার করে নেয় এবং সর্বোপরি জগেনের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানায়। যদিও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিম্নবিত্তে অবস্থান করা এক মধ্যবয়সী মহিলার পক্ষে জগেনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। তার পক্ষে জগেনের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিবাদ জানানো বা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার মতো পথ না থাকাটাই যে স্বাভাবিক তাও লেখক বুঝিয়ে দেন আন্নাকালীর মাধ্যমে।

এখানেই নিম্নবিত্তের জীবন নির্মাণে অনিল ঘড়াইয়ের সার্থকতা। তিনি নিম্নবিত্তের অবস্থা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন ঠিকই কিন্তু বাস্তব চিত্রটিকে মাথায় রেখেছেন প্রতি মুহূর্তেই। তাই চরম সংকটের মধ্যে পড়েও আন্নাকালী স্বামীকে ত্যাগ করতে পারেনি, অর্জুন পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে জোরালো কোনো প্রতিবাদ জানাতে পারেনি বা জগেন চাইলেও যশোদার সম্মানহানি করতে পারেনি। কারণ এরা প্রত্যেকে নিজের নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। এদের বাস্তববুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। মনে রাখা দরকার অনিল ঘড়াই উপরতলার ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিম্নবৃত্তের আখ্যান রচনা করতে বসেননি। তিনি এদের সমতলে অবস্থিত একজন মানুষ, তাই সমতলের দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে জানিয়েছে এই সমাজের লোকেদের মধ্যেও মূল্যবোধ আছে। এদেরও মান অপমানবোধ প্রখর। এরা আদিমপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয় ঠিকই কিন্তু তা বাধ্য হয়েই। তাই জগেন ক্রোধের বশে, মদের নেশায় মাংস পুড়িয়ে ফেলার সামান্য ভুলে আন্নাকালীকে শাবলের আঘাতে খুন করে ফেলে। কিন্তু নিমেষেই সে বুঝতে পারে সে কী পাপ

কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। পাপবোধে তখন সে চোখে অন্ধকার দেখে। এতদিন ধরে সে নিজের পাপে যে পৃথিবী নির্মাণ করে এসেছে সেই পৃথিবীর মাটি মুহূর্তে উধাও হয়ে যায় তার পায়ের নীচে থেকে। এতদিনে জগেন ভয় পায়। এতদিনে সে উপলব্ধি করে স্বার্থবুদ্ধিতে চোখ অন্ধ হলে মানুষ কোন সংকটের সামনে এসে দাঁড়ায়।

তার এই একটা কাজ তাদের প্রত্যেকের জীবনকে তছনছ করে দেয় মুহূর্তের মধ্যেই। অর্জুনের বেঁচে থাকার অবলম্বনকে জগেন কেড়ে নেয় নিষ্ঠুরভাবে, অর্জুনকে করে দেয় চরম একা। ফলে অর্জুন সংসারের সমস্ত বস্তুর প্রতি আসক্তি হারায়। আন্নাকালীর যে স্বপ্ন ছিল টিয়ার সঙ্গে অর্জুনকে ঘর বাঁধতে দেখার তার মৃত্যুতেও সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় না। তাদের প্রেম পরিণতি পায় না। তাদের জীবনের প্রেমের মুকুল ঝরে পড়ে যায় অচিরেই। লেখক দেখিয়ে যান কঠোর বাস্তব হয় তো এরকমই, যেখানে মায়ের জন্য চরম দুঃখের অন্ধকারে অর্জুন নিপতিত হয়ে টিয়ার বা নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবার মতো অবকাশই পায় না। সে দেশ ছেড়ে চলে যায়। মায়ের মৃত্যুতে তার যাবতীয় পিছুটান তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। তার মায়ের খুনী যে তার বাবা এই নগ্ন সত্যকে সহ্য করতে পারে না। আর কিছু না করতে পারার লজ্জা তাকে বাধ্য করে গ্রাম ছাড়তে। এইভাবেই জগেন-যশোদা-আন্নাকালীর ত্রিকোণ প্রেমের কাছে অর্জুন-টিয়া-বাসমতীর ত্রিকোণ প্রেম ভ্রূণ অবস্থাতেই নষ্ট হয়ে যায়, মুকুল থেকে কচিপাতার সবুজ রঙ তাতে ধরে না।

জগেন এই ঘটনার তীব্র প্রতিঘাতে হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। পরিবারকে হারিয়ে তার নিজের প্রতিই জন্মায় ঘৃণা। সে এতদিনে নিজের কৃতকর্মের জন্য পাপবোধ অনুভব করে। সরকারি চাকরির সুবাদে সে খুনের দায় থেকে বেঁচে যায় কিন্তু পাপবোধ তাকে কুরেকুরে খেতে থাকে। অন্যদিকে যশোদা শিকার হয় সমাজের উঁচুতলায় থাকা তথাকথিত ভদ্র বাবুদের

উন্মত্ত লালসার। রাখালের পেটে ভাত জোগাতে বাবুদের বাড়ি কাজ করতে গিয়ে তাকে ধর্ষিত হতে হয় তিনজন বাবুর দ্বারা। এতদিন ধরে যে সম্মানকে সে জীবনের বিনিময়েও খোয়াতে রাজি হয়নি সেই সম্মানকেই অন্ধকার বাঁশবনে ছিন্নভিন্ন করে নষ্ট করে শহরের বাবুরা। ধর্ষিত যশোদার আশ্রয় জোটে হাসপাতালের বেডে। সে বুঝতে পারে জগেন তাকে সত্যিই ভালোবেসেছে তাই ক্ষমতা থাকলেও যশোদার উপর জবরদস্তি সে কোনোদিনই করেনি। তারপর নিঃসঙ্গ জগেন কর্তব্যের বশেই যশোদা ও রাখালের দ্বায়িত্ব তুলে নেয় নিজের কাঁধে। যশোদাও এতদিনে জগেনের প্রেমের মুকুলের গন্ধকে অনুভব করে। তারা একে অপরের অবলম্বন হয়ে পা বাড়ায় নতুন জীবনের পথে।

এতদিন পর্যন্ত রচিত ইতিহাস বলে এসেছে নিম্নবৃত্তের জীবনে আদিম প্রবৃত্তিই মূল চালিকাশক্তি। ইতিহাসের সেই প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে অনিল ঘড়াই প্রমাণ করলেন আদিম প্রবৃত্তিই তাদের জীবনে সব নয়। সেই কারণেই জগেন প্রবৃত্তির দাস হলেও যশোদাকে ধর্ষিত হতে হয়েছে সমাজের উঁচুতলার মানুষের কাছেই। যুগের পর যুগ ধরে চলা উঁচুতলার মানুষের নিষ্পেষণ তাদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে প্রবৃত্তিকে বশ করে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারার অক্ষমতা। নীচুতলার মানুষেরা আসলে উঁচুতলার মানুষের কাছে চিরকালই ধর্ষিত হয়ে এসেছে। তাদের ক্ষমতার এই আস্ফালনই নীচুতলার মানুষের বেঁচে থাকাকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। সেই কারণেই চিরকালের না খেতে পাওয়া মানুষগুলো ক্ষমতা পেলেই হয়ে ওঠে এক একজন জগেন জমাদার। অভাব থেকেই তাদের মধ্যে জন্ম নেয় মূল্যবোধহীনতা। কিন্তু তারপরেও তাদের মধ্যে থাকা প্রেমের বোধের মৃত্যু ঘটে না। তাই ‘প্রাগৈতিহাসিক’ এর পাঁচি ও ভিখুর মতো শুধুই প্রয়োজনের সম্পর্ক তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। জীবনে অভাব ও অপূর্ণতার অভিশাপ নিয়ে জন্মানো মানুষগুলো সমস্ত ভুলের শেষে একে অপরের হাত জড়িয়ে ধরে। তাই উঁচুতে থাকা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে যে নকল চশমা উপহার দেয় সেই চশমাকে সরিয়ে রেখে

নীচের দিকে নেমে এলেই দেখা যায় আদিম কলুষতা, এবং সেটা শুধুই নিম্নবিত্তের একার বস্তু নয়, বরং নিম্নবিত্ত বাধ্য হয় সেই কলুষতার পাঁকে শরীর ডোবাতে। তখন দেখতে পাওয়া যায় একজন জগেন ও একজন যশোদা হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে এক নতুন সূর্যোদয়ের দিকে। তারা চলেছে এমন এক সমাজের উদ্দেশ্য যেখানে সমাজের রক্তচক্ষু প্রেমের মুকুলকে নষ্ট করে না, তাকে বেড়ে ওঠার জন্য নির্মল মাটি দেয়। অর্জুনদের সেখানে পালিয়ে বেড়াতে হয় না, বাসমতীও সেখানে অতৃপ্ত তৃষ্ণা বুকে বয়ে বেড়ায় না। তারা সবাই সুখী হয়। সবাই মুকুলের গন্ধকে প্রাণ ভরে উপভোগ করে।

তথ্যসূত্র

১) অনিল ঘড়াই, ‘মুকুলের গন্ধ’, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১।

২) তদেব, পৃ. ৩।

৩) তদেব, পৃ. ২।

৪) তদেব, পৃ. ১২।

চতুর্থ অধ্যায়

‘জন্মদাগ’: নিম্নবিত্তের জীবনে চিরকালীন অভিশাপ

অনিল ঘড়াই এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হল ‘জন্মদাগ’। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে। প্রথম দিকে পাঠক মহলে ততটা সাড়া জাগাতে না পারলেও পরবর্তীকালে ঠিকই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে নিজের জায়গা করে নেয়। অনিল ঘড়াই তাঁর সাহিত্য জীবনে দলিত, নিম্নবিত্ত মানুষদের জন্য কাজ করে গেছেন, আর তাই তাঁর প্রায় সব লেখাতেই আমরা এইসব দলিত, আদিবাসী, নিম্নবিত্ত মানুষদের কথা খুঁজে পাই। ‘জন্মদাগ’ উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়, এই উপন্যাসটিও নিম্নবিত্তদের নিয়েই রচিত। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের নিম্নবিত্তদের অবস্থান তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাঁর প্রথম তথা অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস ‘নুনবাড়ি’-তে তিনি সুন্দরবনের আদিবাসীদের জীবন পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন, আবার ‘অনন্ত দ্রাঘিমা’ উপন্যাসে তিনি নদীয়ার ‘রাজোয়ার’ সম্প্রদায়ের আর্থিক, সামাজিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। ‘সামনে সাগর’ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য ছিল দিঘার সমুদ্রকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করা জেলে সম্প্রদায়। তাঁর উপন্যাসের পরিধি আবার শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ‘দৌড়বোগরার উপাখ্যান’ উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু বিহারের উপজাতি সম্প্রদায়।

‘জন্মদাগ’ উপন্যাসটিও গড়ে উঠেছে নদীয়ার বেথুয়া, কালীগঞ্জ, দেবগ্রাম এইসব অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। যদিও উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কোন আদিবাসী নয় বরং একজন নিম্নবর্ণের হিন্দু ছেলে

বাবলু। সমস্ত ঘটনা লেখক বাবলুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত করেছেন। গ্রামের মধ্যে হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, আর সেই হাসপাতালকে কেন্দ্র করে এবং সেই হাসপাতালের নানা রকমের কর্মীদেরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি গ্রাম। গ্রামের মানুষের টুকরো টুকরো জীবনের ভেতর দিয়ে অনিল ঘড়াই ধরতে চেয়েছেন একটি সমগ্র অঞ্চলের, একটি নিম্নমধ্যবিত্তের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনকে, যেসব মানুষদের মাসের প্রথমদিনই মাইনের সব টাকা আগের মাসের ধার মেটাতে ফুরিয়ে যায়। জগন্নাথ, বাবলার বাবা কাজ করে হাসপাতালে, ঝাড়ুদারের চাকরি। ফলে তার বেতন সামান্যই, আর তাই সারাবছরই তাকে ধার করে সংসার চালাতে হয়। মাসের প্রথম দিন যখন সে মাইনে পায় সেদিনও সে খুব খুশি হতে পারেনা, কারণ আগের মাসে ধার গুলোর কথা তার মনে পড়ে যায়। তাই সে বাবলুকে নিয়ে হিসাবে বসে। একজন আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের জীবনে টাকাপয়সা বড় বালাই, তাকে সবদিক বুঝে সংসার চালাতে হয়। কিন্তু এত কিছু কষ্টের মধ্যেও তারা সুখ খুঁজে নিতে জানে, তারা জানে কি করে অল্প পুঁজির মালিক হয়েও বিশাল পুঁজির মালিক হওয়া সম্ভব। জগন্নাথ তার পাওনা অল্প মাইনে আনলেও, সেদিন তাদের বাড়িতে খুশির হাওয়া উঠে। সারামাস একটা সবজি দিয়ে ভাত খেতে খেতে তাদের মুখে স্বাদ চলে যায়, কিন্তু মাইনের দিন তাদের বাড়িতে ভালো ভালো রান্না হয়, বাবলু তার বাবার কাছে আবদার ধরলে জগন্নাথ সেটা মেটানোর চেষ্টা করে, স্ত্রী রমাও সেদিন সেজেগুজে খুশি হয়ে থাকে। আসলে নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনে চাহিদা খুব বেশি নয়, তারা অল্পতেই খুশি।

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিশগুলো পেলেই তাদের সংসার চলে যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে তাদের কপালে সেটুকুও জোটে না। আর তাই জগন্নাথকে হাসপাতালের কাজ করেও মেথরের কাজ নিতে হয়। জগন্নাথ যা মাইনে পেত সেটাতে আর যাই হোক ঠিকভাবে সংসার চলেনা। আর

তাই সে ঠিক করে যে 'বাবুদের' বাড়ি মেথরের কাজ করবে, তাতে যেটা উপরি পাওনা হবে সেটাই বাড়তি লাভ। গ্রামের জমিদার কেলে দত্তর বাড়িতে সে ট্যাঙ্ক সাফ করতে যায়, সঙ্গে যায় আদিবাসী লছমন ও বিন্দিয়া। অনিল ঘড়াই উপন্যাসে এই অংশটির বর্ণনায় অসাধারণ কয়েকটি সংলাপের মাধ্যমে সমাজে আদিবাসী ও নিম্নবিত্তদের অবস্থান চিহ্নিত করেছেন,

"লছমন কোথায় গর্ত খোড়া হবে দেখবার জন্য যাচ্ছিল, সংগে সংগে হায় হায় করে উঠলেন কেলে দত্ত, ওদিকে যেও না, শুকনো শাড়িটায় ছোঁয়া লাগলে আবার যে ধুতে হবে।"[১]

নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবিত্তের যে একরাশ ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নেই সেটাই এই বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। নিম্নবর্গদের তারা অস্পৃশ্য মনে করে, যুগ অনেক এগিয়ে গেছে, মানুষ এখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ভাবনাচিন্তা সেই মধ্যযুগেই পড়ে আছে। লছমনকে কেলে দত্তর টাকা দেওয়ার ঘটনা সে কথাটাকেই আর একবার প্রমাণ করে,

"লছমন হাত পাতল। দূরত্ব বজায় রেখে তোল্লা করে হাতের উপর টাকাটা ফেলে দিলেন তিনি। হাওয়ায় দশ টাকার নোট দুটো উড়ে পড়ল নীচে। লছমন উবু হয়ে দশ টাকার নোট দুটো তুলে নিলো।"[২]

এই বিদ্বেষ অনেকটা সংক্রমণের মতো, শুধুমাত্র কিছু লোকের মধ্যে আছে সেটা নয়, সমাজে বসবাসকারী প্রায় সকল লোকের মধ্যে একটা ঘৃণা, অস্পৃশ্যতার বোধ সবসময় কাজ করে, আর তাই যখন জগন্নাথও ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার কাজ নেয়, তখন সেও লছমনের মতো অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে, এমনকি কেলে দত্তর বাড়ির কাজের বউটার কাছেও।

"তেষ্টায় গলা শুকাতেই বাবুর বাড়ির কাজের বউটা বলল, কল ছুঁয়ো না। জল খেতে মন চাইলে গ্লাস নীচে নামিয়ে রাখো,আমি জল ঢেলে দিচ্ছি।"[৩]

এখানেই অনিল ঘড়াইয়ের সাফল্য, নিম্নবিত্ত বা শোষিত মানুষ সম্পর্কে ধারণাকেই তিনি আঘাত করলেন। কাকে বলা যাবে শোষিত? কারণ এখানে একজন কাজের মেয়ে যে নিজেও একজন নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, কিন্তু শুধুমাত্র একজন 'বাবু'-র বাড়িতে কাজ করার সুবাদে সেও নিজেকে উচ্চবিত্তের একজন প্রতিনিধি হিসাবে ভাবতে শুরু করেছে, যেটা আদতে সত্যি নয়। শুধুমাত্র অন্যজনের ক্ষমতার আড়ালে দাঁড়িয়ে সেও নিজেকে প্রভাবশালী ভাবতে শুরু করেছে এবং আর একজন নিম্নবিত্তকে হেনস্থা করছে। তাহলে কি নিম্নবিত্তের আসল শত্রু হল আর এক নিম্নবিত্ত? অনিল ঘড়াই এখানে এই প্রশ্নচিহ্ন কিন্তু তুলেই দিলেন। আর একটি ঘটনার উল্লেখ উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়, জগন্নাথ ও চায়ের দোকানদার পবন পালের ঘটনায়। সামান্য চায়ের দোকানে বসার ঘটনা নিয়ে তাদের মধ্যে বচসা ঘটে,

"জগন্নাথ সামনের পেতে রাখা বেঞ্চিটায় বসতে সঙ্কোচবোধ করল। একদিন এই বেঞ্চিতে বসে তাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। পবন পাল তার মুখের ওপর বলেছিল, তোমার সাহস তো কম নয় জগন্নাথদা। এই বেঞ্চিতে গাঁয়ের মাতব্বররা বসে। তুমি বসলে কোন সাহসে ?

কেন বসলে কি হয়? বেঞ্চি তো বসার জন্য।

হ্যাঁ, বসার জন্য। তবে তোমার মত মানুষের বসার জন্য নয়।"[৪]

অনিল ঘড়াই এই বিষয়টিকেই বলেছেন 'জন্মদাগ'। যে দাগ জন্মগত, নিম্নবিত্তের কপালে অদৃশ্যভাবে যেন সেটা লেখা থাকে, যাকে খণ্ডানোর সাধ্য হয়ত তাদের নেই। আর তাই জগন্নাথকে প্রতি পদে পদে অপমানিত হতে হয়, সমাজে এরকম জগন্নাথ আরও হাজারটা আছে। এদের জন্য সমাজ রেখেছে একরাশ ঘৃণা, অবজ্ঞা। আর তাই একজন চাওয়ালা পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়

শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের মানুষদের দেওয়া ক্ষমতার দ্বারা, আর তাই সে আর এক নিম্নবিত্তকে অপমান করতে কুণ্ঠা বোধ করেনা, ভুলে যায় নিজের কপালের 'জন্মদাগ'।

সমাজের মধ্যে সুবিধাবাদী লোকের অভাব নেই, তারা যেরকমভাবে পারে নিজেদের আখের গোছায়। পরিস্থিতি, পরিবেশ কিছুই তারা মানে না, সেরকমই একটি চরিত্র হল কুঞ্জ জটা, সে আসলে একজন ওঝা কিন্তু বাস্তবে ভণ্ডামি করে, ছল চাতুরী করে লোক ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করে। আর এরফলে গ্রামের লোক তাকে বেশ মান্যগণ্য করে চলে। গ্রামের কারোর বিপদ হলে কুঞ্জ জটার ডাক পড়ে। এরকম করে সে বেশ কিছু কাঁচা টাকা আমদানি করেছে। তার মাধ্যমে লেখক সমাজের মধ্যে থাকা ভণ্ডামি, অন্ধবিশ্বাস, লোকাচার এসবের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। এমনকি বাবলু ও ভরতের মত শিক্ষিত ছেলেরাও তার ফাঁদে পড়ে যায়। লাট্টুর হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কুঞ্জ ওঝার কাছে মন্ত্র শিখতে যায়, কুঞ্জ ওঝা তাদের কষ্ট করে জমানো ১০ টাকার বিনিময়ে মন্ত্র সেখাতে রাজি হয়ে যায়, কিন্তু যথারীতি মন্ত্রের কোন কাজ হয়না। এরজন্য বাবলু ও ভরত প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কুঞ্জ ওঝার মোরগ চুরি করে ও মেরে ফেলে। কিন্তু কুঞ্জ ওঝার আসল প্রকৃতি এবার ধরা পড়ে যায়, রাগে ক্ষ্যাপা হয়ে সে প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে যায়। আর এর জন্য সে অবলা লাট্টুকে মেরে ফেলে। মাধবী দিদিমণির একমাত্র সম্বল লাট্টু মারা যায়। অর্থাৎ, এইসব মানুষদের স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগলেই তারা তাদের নকল খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আস্তে পিছপা হয়না। আবার এই কুঞ্জ কটাই নিজের বিবাহিত স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও জড়িয়ে পড়ে রম্ভার সঙ্গে। রম্ভার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেছে, আর সেই জন্য সেও বড়োলোক কুঞ্জ কটার সাথে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

অনিল ঘড়াই এর উপন্যাসের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য প্রায়ই চোখে পড়ে, সেটা হল পরকীয়া প্রেম, বা হয়ত বলা ভালো যে অনিল ঘড়াই যাদের নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন বা তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য যারা, সেই নিম্নবিত্ত সমাজের একটা অচ্ছেদ্য অংশ হল পরকীয়া প্রেম। আর তাই পরকীয়া প্রেমের প্রসঙ্গ তাঁর উপন্যাসের মধ্যে বারেবারেই ফিরে ফিরে আসে। হিমানী ও গজাননের সম্পর্কের মাঝেও সেরকম একজন আসে, বাসুদেব। এই বাসুদেব সম্পর্কে গজাননের ভাই, কিন্তু ভাইয়ের অবর্তমানে নিজের বৌদির সাথে মিলিত হওয়ার আগে সে দুবার ভাবে না। চাকরিসূত্রে গজানন গ্রামের বাইরে থাকে, সপ্তাহে মাত্র একবার বাড়ি আসে, আর সেই সুযোগে সে হিমানীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বাসুদেব হিমানীর সাথে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে এতটাই ভেবে ফেলে যে সে শেষ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের সাথে সরাসরি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে, 'গজানন ধারাল চাকুটার দিকে তাকাল। মানুষ যখন পশু হয়ে ওঠে তখন তাকে বিশ্বাস করা যায় না।'

মানুষের মনের মধ্যে দমিয়ে রাখা এই প্রবৃত্তিকে লেখক অনিল ঘড়াই অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যেখানে মানুষ নিজের চাহিদা পুরণে ব্যর্থ হলে বা নিজের অভীপ্সিত স্বার্থপূরণের মাঝে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে নিজের আসল রূপে প্রকাশ পায়, যে রূপ সম্পর্কে হয়ত তার নিজেরও সম্যক ধারণা থাকে না। মানুষের মধ্যে থাকা এই ছোট ছোট লুকানো জুগুপ্সা প্রকাশে লেখকের জুড়ি মেলা ভার। অন্যদিকে, মেয়েদের মনের একদম গভীরতায় পৌঁছেছেন লেখক। 'নারী চরিত্র বড়ই জটিল'- এরকম নানা কথা সমাজে প্রচলিত আছে। আর তাই একজন নারীর মনের সূক্ষ্ম ভাবনাচিন্তার স্তরে পৌঁছানো একদমই সোজা বিষয় নয়। কিন্তু, এখানে এই অসাধ্য সাধনই করেছেন অনিল ঘড়াই। গজানন বাসুদেবের সাথে মারামারি করার পর হিমানীর সাথে দূরত্ব রাখার

চেষ্টা করে। নানারকম মিথ্যা কথা বলে সে হিমানীর মধ্যে হিংসাভাব আনার চেষ্টা করে। এই অংশটি লেখকের অসামান্য বর্ণনায় পেয়েছে প্রাণ,

"হিমানীর চোখের উচ্ছ্বাস, সাজিয়ে রাখা সৌন্দর্য-ফানুস, সুখের লালচে কমনীয় আভা মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়ে নিষ্ফলা মাটির চেয়েও রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে উঠল, বারবার ঢোক গিলে সে যত স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল, ততই পরাজয় আর নিদারুণ হতাশা-ব্যর্থতা তার সর্বস্য গ্রাস করে নিল। পায়ের তলার মাটি তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বুঝি, কাঁপা কাঁপা চোখের তারায় অভিমানী ঠোট দুটো পচা লেবুকোয়ার মতো শব্দ ঝংকার তুলতে ব্যর্থ হল। তার রক্তমাংসের শরীর যেন মনে হল মাটির বানান পুতুল। এক ফোঁটা জোর নেই, সাহস-শক্তি কোন কিছু নেই। তবু দম দেওয়া পুতুলের মতো হাত-পা নাড়িয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল গজাননের বুকের উপর।"[৫]

এক লহমায় যেন সব বদলে গেল, যে হিমানী গজাননের সাথে থাকলে কোনোরকম উষ্ণতা পেত না, সেই হঠাৎ করে কেমন যেন পাল্টে গেল নিজের স্বামীর অন্যমেয়ের সাথে সম্পর্কের কথা শুনে। গজাননের সাজানো ফাঁদে হিমানী পা দিল, কিন্তু এই পরাজয়ে কোন লজ্জা নেই, বরং আছে নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার গৌরব। আস্তে আস্তে হিমানীর লুকানো অভিমান ভেঙে যায়, সে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে গজাননের হাতে। এখানে লেখকের বর্ণনা কাব্যিক স্তরে উন্নীত হয়েছে, চিত্রকল্পের ব্যবহার লক্ষ করার মতো,

"সুস্থির চোখের তারায় আক্রোশে থরথর কম্পশীলা বাঘিনীর নিষ্ঠুর চোখের ছায়া ভেসে ওঠে, হিমানী এক লহমায় দু-হাতের বেড়ে গজাননকে ঘুরিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসে, ওর প্রশস্ত-নির্লোম বুকের উপর ঝাঁপ দেওয়ার আগে তার রক্তনদীতে জোয়ার আসে, দু-হাত হয়ে ওঠে বনজ কোন লতা, পেঁচিয়ে ধরে পুরুষ শরীর, কামনার আগুনে ঝলসে দিতে থাকে পুরুষমন হৃদয় এবং প্রতিটি চেনা ইন্দ্রিয় এবং অনুভূতির শেকড়। এই উচ্ছ্বাস, ভীষণ-ভয়াল আবেগ, হৃদয়ের আর্তিমাখা আবেদন এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল হিমানী, আজ কী ভাবে হিমজগত থেকে সে ফিরিয়ে আনল নিজেকে, শুধু এই প্রশ্ন জাবর কাটতে কাটতে গজানন টের পেল তার পেশল বুকের কাছে এসে মেয়েলী ঘর্মাক্ত হাত দুটি থেমে গেছে স্বাভাবিক জড়তায়।"[৬]

অন্যদিকে, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের একজন কামাতুর লোভী লোকের ছবি এঁকেছেন লেখক অনিল ঘড়াই। সুবল গ্রামে যাত্রা করে বেড়ায়। নিজে শিল্পী হলেও তার মন কিন্তু শিল্পী সুলভ নয়, নিজের স্ত্রী পরমা থাকলেও সে লছমনের বউ বিন্দিয়ার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। লছমন গরীব আদিবাসী, আর তাই সামান্য একটা পাঁঠা চুরি করার অপরাধে তাকে গ্রামছাড়া করা হয়, বিন্দিয়া ও তার মেয়ে গুড়িয়াকে একঘরে করা হয়। যেখানে উচ্চবিত্তের লোকেরা সমাজে নানাধরনের অপরাধ করেও ছাড় পেয়ে যায়, সেখানে শুধুমাত্র গরীব ও আদিবাসী হওয়ার কারণে লছমনকে গ্রামছাড়া হতে হয়, সমাজের উচ্চ-নীচ এর মধ্যেকার মানদণ্ড এক লহমায় স্পষ্ট হয়ে যায়। আর বিন্দিয়ার এই অসহায়তার সুযোগ নেয় সুবল। বার বার সন্তানসম্ভবা হওয়ার ফলে পরমার শরীরে সেই আগের জৌলুস নেই, আর তাই কামুক সুবল বারবার সাহায্যের নাম করে বিন্দিয়াকে ভোগ করার অছিলা খোঁজে। একদিন সুবলের সব বাঁধ ভেঙ্গে যায়, সে আর কিছু মানতে চায় না, বিন্দিয়াকে তার চাই যে কোন মুল্যেই, তারজন্য তাকে যত নীচেই না নামতে হয় সে নামবে,

"প্রাচীন, আদিম জেদ তার রক্তে বুনো বাঘের শক্তিকে জাগ্রত করল। ছুটে গিয়ে সে বিন্দিয়ার হাত চেপে ধরল, মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে বলল, ভাল করে দেখো আমার ঠোঁট দুটোয় কোন পাপ আছে কি না। আমার এই চোখ দুটোয় ভালোবাসা ছাড়া আর যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে আঙুল ঢুকিয়ে আমাকে অন্ধ করে দাও। আমি কোন বাধা দেব না।"[৭]

কিন্তু এই বিপদের সময়েও বিন্দিয়ার পদস্খলন হল না, সে সুবলের ফাঁদে পড়ল না। সে চিৎকার করে লোক জড়ো করে। কিন্তু সে যাত্রা সুবল ছাড় পেয়ে যায়, বরং বিন্দিয়া ডাক্তারবাবুর কাছে তার অন্য জায়গায় বদলির জন্য আবেদন করে। যদিও তার বদলির অনুমতি মেলে না, আসলে নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের কোন বদলি হয় না, তারা যেখানেই যায় সেখানেই পশুর মতো নিকৃষ্ট বস্তু হিসাবেই প্রতিভাত হয়। আর অন্যদিকে, সুবল ঘৃণ্য অপরাধ করা সত্ত্বেও পরমা তাকে

আবার আগের মতোই আপন করে নেয়, এখানে একজন নারীর চরিত্রের কাঠিন্যতাই প্রমাণিত হয়।

"পরমা নিবিড় ঘন চোখ মেলে দেখে সুবলকে। অতৃপ্তির ধোঁয়াশা আলোয় ঢাকা পড়ে থাকে পুরুষ-শরীর। দু-হাত বাড়িয়ে পুরুষের ক্ষতগুলো ঢেকে দেয় নারী।"[৮]

উপন্যাসের এই দমবন্ধকরা পরিবেশের মাঝে একফালি স্বস্তির বাতাস নিয়ে আসেন যিনি তিনি হলে নিশিকান্ত, সম্পর্কে সুর্যের কাকা। তিনি সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত, তার পার্টির উদ্দেশ্য হল মেহনতি মানুষদের নিজেদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া, অত্যাচারী ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পথে নামা মেহনতি মানুষদের তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। আর সেই উদ্দেশ্যে তিনি সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান, বুনোপাড়ার ভূষণ রাজোয়ারের সাথে মিলিত হয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। নিশিকান্ত নিজে একধরণের আদর্শ নিয়ে বাঁচেন, রাজনীতিটাও সেই একই আদর্শ নিয়ে,

"বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।...ভোগের রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের কমরেডরা কেউ-ই ভোগের পথে হাঁটেন না। ত্যাগ-তিতিক্ষা তাদের পাথেয়। আমি সেই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে কিন্তু পরাজয় হলেও আমি আমার আদর্শ, আত্মসম্মানবোধকে সদানন্দবাবুর মতো তৃতীয় শ্রেণীর লোকের পায়ের কাছে বলিদান দিতে পারব না।"[৯]

বাবলু এই নিশিকান্তকে যত দেখে ততই মুগ্ধ হয়ে যায়, তার মনে হয় একজন মানুষ কি করে এতটা স্বার্থহীন হতে পারে, যেখানে আজকের দিনে সবাই নিজের নিজের স্বার্থ দেখে চলে। নিশিকান্তর কথা গুলো যেন বাবলুর কানে মন্ত্রের মতো মনে হয়, এই অবহেলার পৃথিবীতে সে নতুন করে বাঁচার দিশা দেখতে পায়, নতুন ভোরের স্বপ্ন তার চোখে ভাসে। তারও মনে হয় হয়ত

একদিন তার সমস্ত বঞ্চনা, হতাশার অবসান ঘটবে। কিন্তু অন্যদিকে নিশিকান্তর এই আন্দোলন সহজ কাজ নয়, কারণ যাদের হয়ে তিনি লড়াই করেন অর্থাৎ মেহনতি মানুষগুলির মধ্যেই কিছু সুবিধাবাদী মানুষ আছে, আর তারাই এই আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তারা শুধুমাত্র শোষক শ্রেণীর কাছ থেকে কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে আর তার জন্য আপণ শ্রেণীর মানুষদের বিরুদ্ধাচরণ করতেও পিছপা হয়না। নিশিকান্তদের আন্দোলন এদের বিরুদ্ধেও। আগামীর পথ সহজ নয়, কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু নিশিকান্তরা থামেনা, তারা থামতে জানেনা। শুধুমাত্র বুকে একটাই স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে, 'নতুন সকাল আসবে,আর সেদিন আসতে খুব বেশি দেরি নেই'। অনিল ঘড়াই ও এই একই স্বপ্ন দেখেন, আর তাই তার নানা উপন্যাসে মাঝে মাঝেই ফিরে ফিরে আসে বিপ্লব, বিদ্রোহ, নতুন সকালের কথা। এই উপন্যাসেও নিশিকান্তর মুখ দিয়ে সেই একই কথাই ধ্বনিত,

"গ্রামাঞ্চলে সংগঠন করা যে কত ঝুঁকির কাজ তা আমি ফিল্ডে নেমে বুঝতে পারছি। আমরা যাদের জন্য লড়ছি তারাই আমাদের পেছন থেকে চাকু মারছে। মানুষ হল সুবিধাভোগী জাত। ওদের মুখের সামনে সব কিছু সাজিয়ে দিলে তবেই খাবে। সংগ্রহ করে খুঁটে খুঁটে খেতে ওরা জানে না। তবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই। আমাদের পার্টি একদিন সারা ভারতের মেহনতী মানুষের হাতিয়ার হবে। সেদিন আর বেশিদূরে নেই...আমি তোমার বাবাকে শ্রদ্ধা করি। তিনি তোমাকে ইস্কুলে পাঠাচ্ছেন সেইজন্য। তিনি তার লেভেল থেকে তোমাকে অন্য লেভেলে নিয়ে যেতে চান। এটাও এক ধরণের সংগ্রাম। পার্টির বাইরে থেকেও এমন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যায়।"[১০]

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হল বাবলু, প্রায় সমস্ত ঘটনা তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। সে পড়াশোনায় ভাল, আর তাই তার বাবা ও মায়ের স্বপ্ন তাকে পড়াশোনা শিখিয়ে চাকরি পাওয়াবে, মানুষের মতো মানুষ করবে। তাদের সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ঘটবে,

"আমাদের কি অভাব থাকবে তখন? আমরা বুড়োবুড়ি তখন পায়ের উপর পা তুলে খাবো। তখন মনে হয় এত কষ্ট আর থাকবে না।"[১১]

সমাজের এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে উত্তরণের এক অদম্য প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এই কথার মাধ্যমে। কিন্তু, বাবলুর এই যাত্রা কখনোই সুখের থাকে না, প্রতি পদে পদে তাকে অপমানিত হতে হয়। সমাজের নিচুতলার মানুষ হওয়ার জন্য তাকে বারেবারে সবার হাতে হেনস্থা হতে হয়। আসলে যদি কখনও উচ্চবিত্তের অধিকারে আঘাত করে তাহলে তার ফলাফল সেই মানুষটিকে তৎক্ষণাৎ পেতে হয়, বাবলুর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। একজন 'মেথরের' ছেলে হয়ে সে সবার থেকে পড়াশোনায় কী করে ভাল হতে পারে- এই বিষয়টিকেই কেউ মেনে নিতে পারেনা। ইস্কুলে তাকে সবাই অপমান করে, 'ওরা আমাকে যা-তা বলে ক্ষেপায়। বলে- আমার বাবা নাকি ছোট কাজ করে। মেথর। আমাদের নাকি ছোটজাত?' সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা চালু হয়েছে সেই প্রাচীন যুগে, বর্তমানে যুগ অনেক এগিয়ে গেছে, মানুষ সভ্য হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে, সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথা সেই আগের মতোই থেকে গেছে। আর এর শিকড় সমাজের একদম গভীরে পোঁছে গেছে, আর তার ফলে আগামীর প্রজন্ম যারা আজকে শিশু তাদের মধ্যেও এর বিষবাষ্প ঢুকে গেছে। বাবলুকে তাই স্কুলের সবাই পিছনের বেঞ্চে বসতে বাধ্য করে। গ্রামের জোতদার কেলে দত্ত অত্যাচারী মানুষ, সবাইকে পায়ের নীচে রাখতেই তিনি পছন্দ করেন। তার ছেলে বেলে দত্ত বাবলুর সাথে একসাথে এক ক্লাশে পড়ে। কিন্তু অল্পবয়সেই সেও নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই সে সবসময় বাবলুকে উত্যক্ত করে, বিনা কারণে তাকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করে, সকলের সামনে তাকে অপদস্থ করে। 'ছোটলোকের' ছেলে বলে বাবলু সব মুখ বুজে সহ্য করে। ইস্কুলের মাস্টারকে বলেও কোন লাভ হয়না কারণ মাস্টারমশায় নিজেই কেলে দত্তর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে বসে থাকে। কিন্তু 'গরীব, ছোটলোক'-এর যখন মার খেতে খেতে দেওয়ালে পিঠ থেকে যায় তখন সেও রুখে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে ওঠে।

এখানেই ঠিক তাই ঘটে। প্রায় রোজ বেলে দত্তের হাতে মার খেতে খেতে বাবলু একদিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে বেলে দত্তের পিছনে সূচ ফুটিয়ে দেয়। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গরিবের যেন এ এক মূর্ত প্রতিবাদ, প্রকৃতিও যেন শোষকরূপী বেলে দত্তের হেনস্থায় যারপরনাই খুশি,

"টিংকু ভয়ে ভয়ে বাইরে এসে দেখল, বাবলা নেই। একরাশ হাওয়াই বুনো বাবলার ডালটা নড়ছে খুশিতে। মাঠপালান হাওয়ার গতিতে পালিয়ে গেছে বাবলা।"[১২]

বাবলুকে বোঝে একমাত্র ডাক্তারবাবুর মেয়ে টিংকু। তার সাথে বাবলুর বন্ধুত্ব। শ্রেণিগত পার্থক্য থাকলেও সেসব বিষয় তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোন দূরত্ব তৈরি করেনা। এর প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় টিংকুর বেড়ে ওঠা। সে বড়োলোকের মেয়ে, কিন্তু তার বাবা-মা, বিশেষ করে তার মা তাকে এমনভাবে বড় করেছে যে তার মধ্যে উচ্চবিত্ত হওয়ার জন্য কোন আলাদা অহঙ্কার কাজ করেনা। আর তাই সে সহজেই বাবলুর সাথে ঘুরতে যেতে পারে, বাবলুর সাথে ফুল তুলতে যেতে পারে। বাবলু অনায়াসে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করতে পারে, সেখানে গেলে সে যথেষ্ট আতিথেয়তাও পায়। এমনকি বাবলুর বাবা জগন্নাথেরও তার বাড়িতে রোজ এক কাপ চা বাধা। চা খাওয়ার পর জগন্নাথ চায়ের কাপ ধুতে গেলে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অনন্যা বিরক্ত হন,

"তোমার এঁটো কাপ ধুলে যদি আমার পুণ্য হয় তুমি কি তাহলে আমাকে সেই পুণ্যটুকুও করতে দেবে না?"[১৩]

অনন্যার এই কথার মাধ্যমে তার উদারতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি হাসপাতালের নার্স মাধবী দিদিমনিও জগন্নাথের খুব কাছের মানুষ। সে রোজ নিয়ম করে বাবলুকে পড়া দেখিয়ে দেয়, জগন্নাথের সবরকম অসুবিধার সময় পাশে থাকে। নিজে বিয়ে করেনি, কিন্তু এই ছোট্ট গ্রামকে সে নিজের আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধে ফেলেছে, তার মনে উচ্চ-নীচের কোন ভেদ নেই। এইসব টুকরো

টুকরো ঘটনাই সমাজ পরিবর্তনের, নতুন দিনের দিকে ইঙ্গিত দেয়- যেখানে কাউকে নিজের বংশগত, সম্পত্তিগত বিষয় দিয়ে বিচার করা হবে না।

অনিল ঘড়াই মজদুর, মেহনতি মানুষদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থানের কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে তাদের ছোট ছোট মানসিক টানাপোড়েনের কথাও উল্লেখ করেছেন। যৌবনে মাধবীর সঙ্গে ডাক্তার ভদ্রের ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু ডাক্তার ভদ্র ছিলেন বিবাহিত পুরুষ, আর তাই নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাদের সম্পর্ক শুরু হতে না হতেই শুকিয়ে যায়। আর তারপর থেকে মাধবী দিদিমণি অবিবাহিতই থেকে যায়। গ্রামের মানুষ ও হাসপাতালের কাজ নিয়েই খুশি থাকে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা সুপ্ত বেদনা সে সবসময়ই অনুভব করে যদিও সে কাউকে কোনদিন এ বিষয়টা বুঝতে দেয়নি। অন্যদিকে, ভিটের টান বড় বালাই। জগন্নাথের বদলির চাকরি, অনেক কষ্টে বদলি পেয়ে সে নদীয়ার হাসপাতালে ঝাড়ুদারের চাকরিটা জুটিয়েছে। কিন্তু তার আসল বাড়ি হল মেদিনীপুরে, আর তাই এখানে সবার সাথে সে যতই একাত্ম বোধ করুক না কেনো, তার মন পড়ে থাকে নিজের জন্মভিটে মেদিনীপুরে। আর তাই প্রতি মাসে সে স্বপ্ন দেখে মাইনে পেলেই সে পরিবার নিয়ে একবার নিজের গ্রামে ঘুরে আসবে। সেখানে সে সবার জন্য 'স্পেশাল' বিড়ি নিয়ে যাবে, সবাইকে তার চাকরির গল্প করবে। কিন্তু তার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দেয় অফুরন্ত অভাব। মাসের প্রথমে মাইনে পেলেও সব টাকা খরচা হয়ে যায় ধার মেটাতে। বাধ্য হয়ে নিজের স্ত্রী রমার জন্য একটা কাজের খোঁজে সে হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে আবেদন পর্যন্ত করে। কিন্তু সে যাত্রা রমার কপালে চাকরি জোটে না। রুক্ষ বাস্তব, অভাবের সংসারে দাঁড়িয়ে তাই তার স্বপ্ন 'দিবা-স্বপ্নে' পরিণত হয়। আসলে স্বপ্নপূরণের অধিকার থেকে নিম্নবিত্তরা চিরকালই হয়ত বঞ্চিত থেকে যায়।

এইসব টুকরো টুকরো ঘটনার মাধ্যমে লেখক 'নিম্নবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের' ইতিহাসকে হয়ত ধরতে চান।

ভরতের মাধ্যমে লেখক বিশ্বাসভঙ্গের বিষয়টিকেই তুলে আনতে চেয়েছেন। বাবলু ও ভরত হল এককথায় হরিহর আত্মা। প্রায় সব কাজই তারা একসাথে করে, বাবলুর জীবনের অনেকটা জুড়েই বিরাজ করছে ভরত। আখের খেত থেকে আখ চুরি, লাট্টুর পিছনে লাগা ও তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া, কুঞ্জ কটার মোরগ চুরি প্রায় সব ঘটনাই এই দুজন একসাথে ঘটিয়েছে। কিন্তু, এতকিছুর পরও শেষরক্ষা হয়না। ভরত তার আসল রূপ দেখিয়েই দেয়। ভরত বড়োলোক ঘরের ছেলে আর অন্যদিকে বাবলু মেথরের ছেলে। তাই তাদের বন্ধুত্ব ভরতের বাবা কোনদিনই মেনে নেয়নি, ভরত প্রথম দিকে এসব ব্যাপার নিয়ে অত নাক ঘামাত না। কিন্তু শেষে সেও বাবলুকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। নিম্নবিত্তের ওপর বৈষম্যের শেষ আঘাতের খাঁড়া লেখক দিয়েছেন অপ্রত্যাশিতভাবেই। স্কুলের খেলা দেখার জন্য সবাইকে বাসে করে বেথুয়া নিয়ে যাচ্ছিলেন সত্যবাবু, কিন্তু সেখানে বাবলা আর সূর্যের কোন স্থান হয় না, ভরতই তাদের পরিচয় সম্পর্কে সত্যবাবুর কাছে গিয়ে বলে দেয়। বাবলার মনে প্রশ্ন জাগে,

"ভরত তার চাইতে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ে। সে যদি যেতে পারে তাহলে বাবলা কেন যেতে পারবে না? তার দোষ কোথায়? সে জগন্নাথের ছেলে বলেই কি তার খেলা দেখার সুযোগ অধিকার নেই? তার বাবা যদি জগন্নাথবাবু না হোত তাহলে সে নিশ্চয়ই খেলা দেখার সুযোগ পেয়ে যেত।"[১৪]

বাবলার এই প্রশ্ন কি শুধু তার একার? পাঠকের কি কিছু দায় থাকে না? অনিল ঘড়াই সেসব প্রশ্ন তুলেই রাখলেন, উত্তরের দায় হয়ত আমাদের সকলের।

যদিও চূড়ান্ত আঁধারের দিনেও লেখক আলোর সন্ধান করছেন বা বলা ভাল আশা রাখছেন। তাই, উপন্যাসের শেষে তিনি পাঠকের সামনে সেই আলোর সামান্য আভাস দিয়ে রাখলেন। বাবলু ও সূর্য অপমানিত হওয়ার পরেও খেলা দেখার তীব্র ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে যায়। পথে তাদের দেখা হয় জোতদার বেলে দত্তের সাথে, সে তাদের সাহায্যের নাম করে আরও অপদস্থ করে। তাদের দিয়ে রিকসা টানিয়ে নেয়, পরিবর্তে তাদের বেথুয়াতেও পৌঁছে দেয় না। বাস ভাড়ার জন্য টাকা চাইলে বেলে দত্ত তা দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু এত কিছু করেও তাদের থামানো যায় না, তারা হাঁটার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আজ গন্তব্যে না পৌঁছে কিছুতেই থামবে না। উপন্যাসের শেষে সেই হার না মানা বালকের অটুট মনোভাবের কথা ফুটে উঠেছে। রূপকের আশ্রয়ে হয়ত লেখক নিম্নবিত্তের সেই নতুন ভোরের আশায় ছুটে চলার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। অনিল ঘড়াইয়ের অসাধারণ লেখনীতে উপন্যাসের শেষে তাই পাঠকের চোখে লেগে থাকে মুগ্ধতা,

"চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে ছুটছিল দুটি বালক। সে দৌড় বাঁচানোর দৌড়। নৈঋতে তখন মেঘ জমেছে। কালো মেঘের বুক চিরে ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুৎ-এর সাপ। ভয় মাখানো হাওয়া এসে জড়িয়ে যাচ্ছে গায়ে। নাগাদি আসতেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল। বাবলা আর ছুটতে পারছিল না, ভারী হয়ে এসেছে পা। সূর্য তবু ক্লান্তহীন। সে বাবলাকে বোঝাল, 'পথের শেষ আছে কিন্তু ক্লান্তির কোন শেষ নেই। আমার কাকা বলে-যুদ্ধ করে জিততে হয়। যারা হার মানে নদী তাদের জল দেয় না। গাছও তাদের ছায়া দেয় না। এতদুরে এসে আমরা কেন হেরে যাব? চল পা ঝেড়ে নিয়ে দৌড়াই।'

মেঘে ঢাকা পৃথিবীর নীচে দুটি বালক ছুটতে থাকে। সেই প্রথম শুরু হয় তাদের জীবনের দৌড়।"[১৫]

তথ্যসূত্র

১) অনিল ঘড়াই, 'জন্মদাগ', কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৯৪।

২) তদেব, পৃ. ৯৫।

৩) তদেব, পৃ. ৯৬।

৪) তদেব, পৃ. ৭৩।

৫) তদেব, পৃ. ১৫৯।

৬) তদেব, পৃ. ১৬০।

৭) তদেব, পৃ. ২০৮।

৮) তদেব, পৃ. ২০৯।

৯) তদেব, পৃ. ১২৮।

১০) তদেব, পৃ. ১২৮-১২৯।

১১) তদেব, পৃ. ৭৯।

১২) তদেব, পৃ. ১১৮।

১৩) তদেব, পৃ. ২০।

১৪) তদেব, পৃ. ২৩৬।

১৫) তদেব, পৃ. ২৪০।

পঞ্চম অধ্যায়

‘নীল দুঃখের ছবি’- নিম্নবিত্তের দিনলিপি ও তাদের যন্ত্রণার ইতিহাস

অনিল ঘড়াই তাঁর সাহিত্য জীবনে প্রধানত সমাজের পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত এবং প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে বসবাস করা নানা উপজাতি, জনজাতি ইত্যাদি মানুষদের নিয়ে কাজ করেছেন। এক একটি উপন্যাসে তিনি এক এক জাতির কথা বিভিন্নভাবে বলেছেন। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সর্বোপরি মানসিক অবস্থানের কথা তুলে এনেছেন। যে বিষয় নিয়ে বাঙালি পাঠক সামান্যই অবগত ছিল, সেটা অনিল ঘড়াই এর সৌজন্যে পাঠকের সামনে এসেছে।

‘নীল দুঃখের ছবি’ উপন্যাসটি ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশ পায়। এই উপন্যাসটির বাকি উপন্যাসের থেকে প্রাথমিক দিক থেকে স্বতন্ত্র, সেটা উপন্যাসের গঠন দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। গঠনগত দিক থেকে প্রথমেই এই উপন্যাসের যে বিষয়টি বাকি উপন্যাসের থেকে আলাদা করে দেয় সেটা হল এই উপন্যাসটি মোট ৩ টি স্বতন্ত্র কাহিনির সমাহার। সম্ভবত, অনিল ঘড়াই এর আর কোনো উপন্যাসে এই বিষয়টি লক্ষ করা যায় না। উপন্যাসের প্রথম অংশের কোন নামকরণ তিনি করেননি। এই অংশে তিনি প্রধানত কাকমারা সম্প্রদায়ের জীবন, তাদের আশা ও আশাভঙ্গ এবং সেখান থেকে উত্তরণের কথা বলেছেন। অনিল ঘড়াই দ্বিতীয় অংশের নাম দিয়েছেন ‘টিটলাগড়ে সূর্যোদয়’। এই অংশে তিনি প্রধানত নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের জটিলতা এবং মানসিক টানাপোড়েন দেখাতে চেয়েছেন। আর উপন্যাসের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ অংশের নাম দিয়েছেন ‘ছায়াপথ’। এই অংশে লেখক প্রধানত হাসপাতালকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নিম্নমধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ের মধ্যেকার ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে তাদের একটা সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

ক

উপন্যাসের প্রথম অংশে অনিল ঘড়াই কাকমারা সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কাকমারা-রা পশ্চিমবঙ্গের এক আদিবাসী সম্প্রদায়। তারা সাধারণত কোন এক বিশেষ জায়গায় থিতু হয়না। যাযাবরদের মতো এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। কিছুদিন এক জায়গায় থেকে আবার নতুন জায়গার সন্ধানে তারা বেরিয়ে পড়ে। তাদের জীবিকা বলতে সেরকম কিছুই নেই। ভিক্ষাবৃত্তি করেই তারা জীবন কাটায়, মাঝে মাঝে কিছু খুচরো কাজকর্ম করে। তাদের বাসস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলে,

"হাসল দিগম্বর, কাকমারাদের আবার কবে কুনদিন ঘর ছিল? মোর মেনে ঘুরি-ফিরি খাই। বগল বাজাই।"[১]

অনিল ঘড়াই টুকরো টুকরো কিছু ঘটনার মাধ্যমে কাকমারাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে পাঠককে অবগত করেছেন। কাকমারারা যেহেতু যাযাবর জীবন কাটায় তাই তারা যেখানেই যায় সেখানেই তারা নানা ধরণের অপমানের সম্মুখীন হয়। সমাজের অন্য লোকজন তাদের সন্দেহের চোখে দেখে, চোর বলে অপবাদ দেয়। তাদের স্বাভাবিক পোশাক-পরিচ্ছদ লোকজনের হাসির খোরাকি হয়, কৌতূহলের উদ্রেক ঘটায়।

"কুকুরগুলো পাড়া মাথায় তুলে ডাকছে। বটতলায় দাঁড়িয়ে থাকা গোরুগুলোর চোখে-মুখে সন্দেহ। এমন আজব পোশাক, বিচিত্র পেশার মানুষ কদাচিৎ ওদের চোখে পড়ে। পিল পিল করে ছুটে আসছে গাঁয়ের আধা উদোম ছেলে-মেয়ের দল। বড়দেরও উৎসাহ কম নেই। দেখতে দেখতে ভিড় জমে যায় বটতলায়।

কানাকানি কথা সন্দেহ ভাসে হাওয়াই। কে যেন বলে, ইবার সাবধানে থাকতে হবে। গাঁয়ে এবার চুরি-চামারি বাড়বে। কাকমারার দল তাবু না গোটান পর্যন্ত আর শান্তিতে ঘুমানো যাবে না ঘরে।"[২]

কাকমারাদেরকে সমাজে সবাই চোর-ই শুধু ভাবেনা, তাদের ঘৃণার চোখেও দেখে, তাদের অচ্ছুৎ ভাবে। আর তার ফলে তারা যেখানেই যায় সেখানেই বিপদের সম্মুখীন হয়, তাদের দেখে সবাই ভয়ে পালিয়ে যায়, ভিক্ষা পর্যন্ত দেয় না।

"সামনের পুকুরঘাটে নেমে গিয়ে হদী সরিয়ে জলপান করে। তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে গৃহস্বামী, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে, দিলু তো আমার গাড়িয়ার জল দূষিত করে। শালা অচ্ছুৎ। ভিখমাঙ্গা। তোরা আর ঘর পেলি না ভিখ মাঙবার?"[৩]

কিন্তু এখানেই অনিল ঘড়াই এনেছেন নতুন চমক। নিম্নবিত্তরা অত্যাচারিত হতে হতে হয়ত একদিন ঘুরে দাঁড়াবে, এই আশাবাদেরই কথা সকলে বলে, কিন্তু এখানে যেটা ঘটে সেটা অকল্পনীয়। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, অবহেলার বিরুদ্ধে সর্বোপরি সমাজের বিরুদ্ধে যেন এক সরাসরি বিপ্লব ঘোষণা করে ভিক্ষাম্বর। ভিক্ষাম্বরকে ভিক্ষা না দেওয়ার পরিবর্তে তাকে নানা ধরণের বাজে কথা বলে অপমানিত করে। পশুর মতো তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু, ভিক্ষাম্বর চুপ করে সহ্য করার লোক নয়। আর তাই তথাকথিত 'বাবু'-র অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেনি।

"তাহিলে এই নে মোর ভিখ তু। ভিক্ষাম্বরের চাওড়া হাতের পাঞ্জা জড়িবুঁটিতে বশ মানা জাতসাপের ফনার চেয়েও জড়োসড়ো হয়ে আসে। আঙ্গুল সমেত হাতের কব্জি জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় নিজের মুখের ভেতর। 'ওয়াক ওয়াক' বমি ঠেলে আসে। হড়হড়িয়ে বমি ঠেলে দেয় সে বাবুর নিকোন উঠোনে।

চোখ ছিটকে বেরিয়ে আসে জল। অজীর্ণ ভাতের টুকরো গড়িয়ে যায় উঠোনে। চোখ মোছে না, ভিক্ষাম্বর জল ভরা চোখে ফিরে আসে ধুলো পথে। পুরো মুখ তখন শুধু তেতো।"[৪]

ভিক্ষাম্বরের বাবুর সখের উঠানে এই বমি করা আসলে দীর্ঘকাল ধরে ঘটে চলা অবহেলার বিরুদ্ধে এক মূর্ত প্রতিবাদ। কাকমারাদের ওপর টুকরো টুকরো অত্যাচারের ছবি লেখক তুলে ধরেছেন। গ্রামের ঠিকাদার দশরথ মাইতির সামান্য জামবাটি চুরি করার অপরাধে তিনি ঝুমরিকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন, আবার তার স্বামী পীতাম্বরকে বাবুর হাতে বেধড়ক লাঠিপেটা খেতে হয়। কিন্তু, সেই ঝুমরিই যখন বাবুদের প্রায় ডুবে যাওয়া ছেলেকে নিজের প্রাণের মায়া উপেক্ষা করে বাঁচায় তখন দশরথ মাইতি বড়মুখ করে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে আসে। অর্থাৎ, স্বার্থের সামান্য আঘাতে যারা কাকমারাদের সহ্য করতে পারত না, তারাই আবার কৃতজ্ঞতা জানাতে আসে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি হলে । সমাজের কি অদ্ভুত নিয়ম। যদিও কাকমারারা অল্পতেই খুশি। জীবনের কাছে তাদের চাওয়ার বেশি কিছু নেই। দিন আনা দিন খাওয়া লোকগুলো জীবনকে উপভোগ করার সুযোগ খোঁজে।

"শুয়োরের ছা জন্ম নিলে খুশিতে মেতে ওঠে এই ভবঘুরে মানুষগুলো। তাদের মৌজ-মজলিশ জমাবার একটা বাহানা চাই। এর চেয়ে বড় বাহানা আর কিছু নেই।"[৫]

হাজার কষ্টের মধ্যেও কিন্তু নিম্নবিত্তরা স্বপ্ন দেখে। তারাও একটা নতুন ভোরের অপেক্ষা করে। সর্বোপরি, তাদেরও যে একটা মন আছে সেটাই সকলে ভুলে যায়। কিন্তু, তারাও প্রেমে পড়ে এবং বারে বারেই পড়ে। আর এই প্রেম এমন এক জিনিস যে কোন বাধা মানে না, জাতপাত মানে না। সেরকমই ঘটনা ঘটে বিন্দিয়ার সঙ্গে। সে জন্মসূত্রে নিচু জাতের, কিন্তু তার সাথে ভাল লাগার সম্পর্ক তৈরি হয় উঁচু জাতের ছেলে জটায়ুর সঙ্গে। জটায়ু এসব জাতপাত কিছুই মানে না। তার

মনে যুবক বয়সের টাটকা রক্ত ফুটছে। আর তাই সে বিন্দিয়ার জন্য সমস্ত কিছু ছেড়ে দিতে পারে অবলীলায়। কিন্তু, বিন্দিয়ার এসব দেখে ভয় হয়। কিন্তু মুক্তমনা জটায়ু তাকে অভয় দেয়, পাশে থাকার কথা বলে।

"যে কামিনী-কাঞ্চন চেনে না তার কাছে তো সবই কাঁচ। আমার কাছে তুমি কাঁচ নও গো হীরা। তুমারে দেখার পর থেকে ঘর আমার পর হলো। এখন সত্য শুধু তুমি। তুমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। জটায়ুর আবেগভরা কণ্ঠস্বর, তুমাকে চোখ ভরে দেখে নিয়েছি, ইবার তুমি যাও। যদি না দেখা হতো, তাহলে আমি সারারাত মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে তোমার গান গাইতাম। আমি পাগল হয়ে যেতাম।"[৬]

যে সমাজ কাকমারাদের শুধুমাত্র ছেলেধরা, চোর এসবই ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে একজন উচ্চবিত্ত যুবকের কাকমারা মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া এবং তাকে নিয়ে পরবর্তী কালে সংসার করার স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে অনিল ঘড়াই একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন। হয়ত, সুখের সে দিন আর দূরে নেই।

উপন্যাসের মধ্যে আর একটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, সেটি হল পরকীয়া প্রেম। অনিল ঘড়াই এর অনান্য উপন্যাসের মতো এখানেই বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে পরকীয়া সম্পর্কের বাড়াবাড়ি দেখা যায়। তার একটা কারণ এটা যে, নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্পর্কের মধ্যে হয়তো তিক্ততা লক্ষ করা যায়। তাদের না পাওয়ার মধ্যে যে ব্যর্থতার গ্লানি থাকে হয়তো সেখান থেকে মুক্তি পেতে তারা বেছে নেয় আবার একটা নতুন সম্পর্ক। আবার নতুন করে শুরু করবে এই আশায়। কিন্তু, এখানে এই 'পরকীয়া প্রেম' সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা যোগদান করে। বিদ্যাধরী বিশ্বাস করে বিয়ে করেছিল মুকুন্দকে। বিদ্যাধরীর মা দেহপসারিনী ছিল, আর তাই বিদ্যাধরী কোনদিন চায়নি যে সেও তার মায়ের মতো দেহ বিক্রি করে জীবন কাটিয়ে দেবে। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখত সে।

আর এই সূত্রেই তার সাথে আলাপ হয় মুকুন্দর। আস্তে আস্তে ভাললাগাটা পরিণত হয় ভালবাসায় এবং সেখান থেকে বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু, তাদের বিয়ের পরই সমস্ত অশান্তির সুত্রপাত ঘটে। বিদ্যাধরী জানতে পারে যে মুকুন্দর এর আগে বিয়ে হয়েছে, সাবিত্রী নামে তার একটা বউ আছে। যথারীতি যা হওয়ার সেটা হয়, সাবিত্রী তাকে মেনে নেয় না। উঠতে বসতে তাকে অপমানিত হতে হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের যেটা, সেটা হল মুকুন্দও আর বিদ্যাধরী কে মেনে নিতে পারেনা। তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। বাধ্য হয়ে বিদ্যাধরী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু, সেই মুহূর্তে তাকে দিগম্বর উদ্ধার করে। বিদ্যাধরীকে উদ্ধার করে দিগম্বরের জীবনে নতুন বিপদ শুরু হয়। সে নিজে জাতিতে কাকমারা, কিন্তু বিদ্যাধরী উঁচু বংশের বউ। সমাজের কেউই এই কথা জানলে মেনে নেবে না। আবার অন্যদিকে, দিগম্বরের বিবাহিত স্ত্রী আছে। যমুনাবতী এই ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতে পারে না। নিজের চোখের সামনে তার স্বামীর সঙ্গে অন্য জাতের এক মেয়ের ঘনিষ্ঠতা সে মেনে নেয় না। আর তার ফলে, একদিন গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে আত্মহত্যা করে।

উপন্যাসের প্রথম অংশ জুড়ে অনিল ঘড়াই যেন এক স্বপ্নভঙ্গের গাঁথা গেঁথেছেন। বিন্দিয়া স্বপ্ন দেখেছিল জটায়ুকে, তারা নতুন করে বাঁচার মতো বাঁচবে। কিন্তু, তাদের সেই স্বপ্ন মাঝপথেই থেমে যায়। বিদ্যাধরীর মা বাধ্য হয়ে দেহ দান করত, কিন্তু আবার সেই কারণেই রোগে ভুগে সে মারা যায়। আবার বিদ্যাধরীও মুকুন্দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে বিয়ে করে বাঁচার মতো করে বাঁচবে বলে। কিন্তু, সেটাও এক মুহূর্তে ভেঙ্গে যায়। মুকুন্দের আগের বিবাহিত স্ত্রী সাবিত্রী তাকে সহ্য করতে পারত না, মুকুন্দও বিদ্যাধরীকে একপ্রকার বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। উঁচু বংশের বিদ্যাধরীর আশ্রয় হয় কাকমারাদের কাছে। কিন্তু, সেখানেও শুরু হয় ঝামেলা। দিগম্বরের সাথে অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যাধরীর সম্পর্ক পরিণতির দিকে এগোয়, আর উল্টো দিকে

আস্তে আস্তে যমুনাবতীর সঙ্গে দিগম্বরের বেড়েছে দূরত্ব। এই চরম মানসিক চাপ যমুনাবতী মেনে নিতে পারেনি, জীবন যুদ্ধে সে পরাজিত হয়েছে। বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ। আর এভাবেই স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস দীর্ঘতর হয়েছে।

"উঠোন ছাড়িয়ে পুকুরপাড়ে চলে এল দিগম্বর। কোথাও যমুনাবতীর পায়ের ছাপ সে খুঁজে পেল না। হঠাৎ তার চোখ গেল সিঁদুরের আম গাছটার দিকে। এক ফেরতা শাড়ি হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল ভৌতিক চেহারা নিয়ে। শাড়িটা যমুনাবতীর। ভয়ার্ত পায়ে সে সেদিকে ছুটে গেল দিগম্বর। ভোরের আলোয় সে দেখল যমুনাবতীর নিথর দেহ আমগাছের ডালে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে জিভ। দাঁত বসে গিয়েছে ফ্যাকাসে জিভে। দিগম্বর ভোরের বাতাসে গলা ফাঁড়িয়ে কেঁদে উঠল।"[৭]

কিন্তু, এতকিছুর পরও উপন্যাস সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা পায় অনিল ঘড়াই এর লেখনীর দ্বারা। প্রেম কোন বাধা মানে না, সে দুর্বার। তাকে বেঁধে রাখার ক্ষমতা কারোর নেই। আর তাই, যমুনাবতী মারা যাওয়ার পর কাহিনি নতুন মোড় নেয়। দিগম্বর ও বিদ্যাধরীর না বলা প্রেম পূর্ণতা পায়। সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে একদিন তারা একে অপরের কাছে হেরে যায়। নিজেদের সঁপে দেয় অজানা ভবিষ্যতের দিকে। তাদের সম্পর্কে পূর্ণতা দানের মাধ্যমে লেখক পাঠকের সামনে এক নতুন সম্ভবনার কথা জাগিয়ে দেন। বিদ্যাধরী উচ্চবিত্ত হওয়ার কারনে কাকমারারা তাকে সহজে আপন করে নিতে পারে না। তাই তাকে শুদ্ধিকরণের জন্য তাদের গোত্রভুক্ত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যাধরী পুরোপুরি কাকমারা হতে পারে না। দুর্বল মুহূর্তে তার নিজেকে কাকমারাদের থেকে আলাদা বলে মনে হয়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত প্রেমেরই জয় হয়। জাতপাত ভুলে দিগম্বর ও বিদ্যাধরী মিলিত হয়। এখানে অনিল ঘড়াই মানুষের মধ্যেকার সঙ্কীর্ণতাকে দূরে সরিয়ে,

জাতপাতের বাধাকে সরিয়ে এক নিষ্পাপ প্রেমেরই জয়গান গেয়েছেন। আর এখানেই এর সার্থকতা। উপন্যাসের শেষেও এই কথারই প্রতিধ্বনি যেন ধ্বনিত হয় লেখকের কলমে।

"মানুষ পাহাড় ডিঙালেও ভালবাসার টিলা পেরতে পারে না। সে হাত ধরে দাঁড় করায় দিগম্বরকে। বাস্পরুদ্ধ স্বরে বলে, চলো আজ থেকে তোমার দুঃখ আমার দুঃখ। তোমার সব কিছুই আমার। একা থাকার জ্বালা অনেক। আমি হেরে গেলাম।

বড় বাঁধের উপর দুটি ছিন্নমূল মানুষ জীবনের নতুন স্বাদ খুঁজে পায়।"[৮]

২

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশের নাম 'টিটলাগড়ে সূর্যোদয়'। অনিল ঘড়াই কাকমারাদের থেকে কাহিনি সম্পূর্ণ অন্যদিকে নিয়ে গেছেন। কাহিনির পটভূমি উড়িষ্যার এক প্রত্যন্ত এলাকায়। অনিল ঘড়াই এই অংশে কিছু মানুষের টুকরো টুকরো জীবনের গল্প বলেছেন। তাদের মধ্যেকার প্রেম, দ্বিধা-দ্বন্ধ, মানসিক টানাপোড়েন ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে একটা শ্রেণীর সামগ্রিক দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এই অংশে অনিল ঘড়াই একই সাথে বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের কথা বলেছেন। পশুপতি চাকরির সুত্রে নিজের স্ত্রীর থেকে দূরে থাকত, আর সেই সূত্রে তার সাথে আলাপ হয় গুরুবারির। তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক আস্তে আস্তে প্রেমের দিকে এগোয়, কিন্তু পশুপতি কোনদিনই গুরুবারিকে বিয়ে করে না। যদিও এ নিয়ে গুরুবারির মনে কোন দুঃখ ছিল না, পশুপতির দেওয়া ভালবাসা পেয়ে সে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলেই মনে করত। অন্যদিকে, পশুপতির স্ত্রী তার স্বামীর এই সম্পর্কের কথা কিছুই জানত না। কিন্তু, পশুপতির মৃত্যুর পর যখন সে এসব কথা জানতে পারে তখন সে

দুঃখ পায় না, বরং গুরুবারিকে মন থেকে মেনে নেয়। পশুপতির ছেলে মহেশ্বরও তার নতুন মা কে মন থেকেই মেনে নেয়। তারা আরও অবাক হয় যখন জানতে পারে যে পশুপতির কোন সম্পত্তিতে গুরুবারি অংশ নেবে না বরং তার যেটুকু আছে সবটাই সে মহেশ্বরকে দিয়ে দেয়। যখন সবাই নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত সে সময়ে দাঁড়িয়ে গুরুবারির আত্মত্যাগ সত্যিই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

অন্যদিকে মহেশ্বর সেও তার বাপের রাস্তায় হাঁটে। চাকরিসূত্রে গ্রামের বাইরে থাকার কারণে নিজের বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়। নিজের মেয়েকেও সে একপ্রকার ভুলতে বসে। যে মহেশ্বর বিয়ের পরে বারবার নিজের গ্রামে ফিরে যেত শুধুমাত্র তার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু সময় কাটাবে বলে, সেও নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বৃন্দাবনের স্ত্রী মমতার সঙ্গে সে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। মমতার স্বামী বৃন্দাবন পুলিশ ছিল, কিন্তু অনেক বেশি বয়সে তার সঙ্গে বিয়ে হয় মমতার। আর তার ফলে তাদের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না, যৌনসুখ দিতে সে ছিল অপারগ। যুবতী মমতার পক্ষে এই সম্পর্ক মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। আর তাই, তার বাবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বোপরি সমাজের বিরুদ্ধে সে নিয়ে ফেলে শেষ পদক্ষেপ। বিবাহিত মহেশ্বরের সাথে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তাদের দুজনের ছেলেও হয়। সমাজের বিরুদ্ধে মমতার মুখ দিয়ে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর।

"সবাই পাপ বললেও তুমি যা করেছো তা তো আমার কাছে পুণ্যের। তবে আমার সামনে কেউ কিছু বললে আমি তাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব। কোথায় ছিল এই সব মহাপুরুষরা যখন বাবা একটা বুড়োর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিল? কোথায় ছিল তখন এই সমাজ? আমি তোমাদের এই মেকি সমাজকে মানি না। আমি মানি তোমাকে, আমার ছেলে পরাগকে।"[৯]

সমাজের মধ্যে থাকা একপ্রকার মূল্যবোধহীন, স্বার্থপর, লোভী ও অসহায় মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে বৃন্দাবন। সে এককালে পুলিশ ছিল, কিন্তু তাকে তার ছেলে ও স্ত্রী ত্যাগ করে চলে যায়। যার ফলে সে মেয়ের বয়সী মমতাকে বিয়ে করে। কিন্তু, কোনদিনই তাদের দাম্পত্য সুখের হয় না। সারাদিন মদের নেশায় চুর হয়ে থাকে সে। কিন্তু, সে যা পেনশন পায় তাতে সংসার ঠিক করে চলে না। আর তাই, মমতার সঙ্গে মহেশ্বর-এর সম্পর্কের কথা জেনেও সে চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে মহেশ্বরকে মেরে ফেলতে চাইলেও সে নিরুপায়, কারণ মহেশ্বরের টাকায় তার সংসার ও মদের খরচ চলে। পরাগ যে তার ছেলে নয় এটা জানার পরও সে কেঁচোর মতো ঘরের এক কোণে পড়ে থাকে। বৃন্দাবন চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে অনিল ঘড়াই একপ্রকার মানসিক বিকারগ্রস্থ, পঙ্গু ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ছবি এঁকেছেন।

যদিও, সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়ে শুধুই বিশ্বাসভঙ্গের ছবি আছে এমনটা নয়। বরং আছে বিশ্বাস স্থাপনের চিত্র। মহেশ্বরের নতুন সম্পর্কের কথা গ্রামে গ্রামে প্রচার হয়ে যায়। তার স্ত্রী শোভার কানেও সে কথা যায়। স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় সে যারপরনায় বিরক্ত হয়, মনের দিক থেকে হতাশ হয়ে পড়ে। আর তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই নিজের মেয়েকে নিয়ে চলে আসে মহেশ্বরের ঠিকানায়। এখানে এসে সমস্ত কিছুই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। নিজের বিবাহিত জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মমতাকে দেখে নিজের ব্যর্থতাই তার বেশি করে মনে হয়। কিন্তু নিয়তির কি পরিহাস! মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। যে মুহূর্তে শোভা মহেশ্বরের সাথে সমস্ত সম্পর্কের ইতি টানার কথা কল্পনা করে সেই মুহূর্তেই সে পরাগকে দেখতে পায়। পরাগের চেহারার মধ্যে সে যুবক বয়সের মহেশ্বরকে দেখতে পায়। সে ফিরে পায় নিজের ফেলে আসা সুখের সময়ে কাটান বিবাহিত দিনগুলিকে। পরাগকে সে বুকে জড়িয়ে ধরে, পূর্ণ হয় তার

মাতৃত্ব। আর এখানেই একজন হারতে বসা মানুষ শেষ পর্যন্ত জিতে যায়। অনিল ঘড়াই এর অসামান্য বর্ণনায় শেষের এই অংশটি পায় এক অন্য মাত্রা।

"তারায় ভরা আকাশের নীচে আবেগের নদীটা বয়ে যায় সন্তর্পণে। বাতাস বয়ে নিয়ে যায় আত্মজ'র সুগন্ধ। গুমড়া পাহাড়ের শিবমন্দির সত্যিই ভীষণ জাগ্রত। বুড়ো শিব কাউকেই খালি হাতে ফেরায় না। পরাগকে বুকে জড়িয়ে ধরে শোভার মনে হয়- তার আর কোনো দুঃখ নেই। এত বছর ধরে হারতে হারতে সে জিতে গেছে শেষ সময়।"[১০]

গ

অনিল ঘড়াই উপন্যাসের তৃতীয় অংশের নাম দিয়েছেন 'ছায়াপথ'। এই অংশে তিনি একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প বলেছেন। আর সেই সূত্রে গল্পের মধ্যে এসেছে প্রেম, বিরহ, বিশ্বাসঘাতকতা, যন্ত্রনার নানা ছবি। নিম্নবর্গের গল্পের বয়ান থেকে অনিল ঘড়াই এখানে অনেকটাই সরে এসেছেন।

গল্পের কাহিনি প্রধানত আবর্তিত হয়েছে গুরুপদ ও কাননের পরিবারকে কেন্দ্র করে। যদিও এই অংশের প্রধান চরিত্র হিসাবে পাঠক ইরাকেই গণ্য করে। ইরার চোখ দিয়েই সম্পূর্ণ উপন্যাস এগিয়েছে। অনিল ঘড়াই এর এই উপন্যাস এদিক থেকেও বাকিদের থেকে পৃথক, কারণ এই প্রথম তিনি কোন নারীর চোখ দিয়ে ঘটনাকে দেখিয়েছেন। ইরার দুই ভাই পল্টু ও বিল্টু। পল্টু বয়সে ছোট হলেও তার পড়াশোনায় মন নেই, সারা গ্রামে শয়তানি করে বেড়ায়। কিন্তু ইরা সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের মানুষ। অভাবের তাড়নায় তার পড়াশোনা অল্প বয়সেই থেমে গেলেও তার ভাবনাচিন্তা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। গরীব হলেও সে হারতে জানে না, সবসময় মাথা উঁচু করে সে বাঁচতে চায়।

মা বাবার দুঃখ কি করে দূর করবে সেই চিন্তায় সে মশগুল থাকে, কিন্তু নিজের সামান্য ক্ষমতা নিয়ে সে আর কিই বা করতে পারে। আবার অন্যদিকে, তার বাবা-মা অনান্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো সবসময় চিন্তায় থাকে তাদের এই ঠোঁটকাটা মেয়ের বিয়ে নিয়ে।

ইরা সবসময় পরিবারের চিন্তা করে, যার জন্য সে গ্রামের ছেলেদেরকে টিউশনি করায়। বাকি মেয়েদের মতো তার জীবনেও প্রেম আসে। তার বান্ধবী মাধবীর ভাই মঙ্গলের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মঙ্গলকে বিয়ে করে নতুন সংসার সাজানোর পরিকল্পনাও সে করে নেয়। কিন্তু, মঙ্গল হঠাৎ একদিন তাকে রেখে দিয়ে কলকাতায় পড়তে চলে যায়। বেশ কিছু বছর পর ফিরে এসে মঙ্গল জানায় যে সে এখন অন্য একজন কে ভালবাসে এবং তাকেই বিয়ে করবে। ইরাকে সে বিয়ে করতে পারবে না। এক লহমায় ইরার মনের ভিতর জমে থাকা স্বপ্ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আবার অন্যদিকে, ইরাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে থাকে জয়দেব। সে গাড়ি চালায়, ইরাদের বিপদের সময় অনেক উপকার করেছে। আর তাই, ইরার বাবা-মায়ের ইচ্ছা যে ইরার সাথে জয়দেবের যেন বিয়ে হয়। কিন্তু ইরার জয়দেবের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। আসলে মঙ্গলের সাথে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার পরে ইরার মনটাই প্রেম শূন্য হয়ে পড়েছিল। টুনি দিদিমণির প্রশ্নের দেওয়া উত্তরে অন্তত এমনটাই মনে হয়-

"ইরার হাই উঠে এল গলায়, চোখে জড়িয়ে যেতে চাইল ঘুম, তবু সে অলস আড়মোড়া ভেঙে বলল, আমার প্রেম ন্যাপথলিনের বলের মতো উড়ে গিয়েছে। যেটুকু সুবাস ছিল তাও হারিয়ে গেছে।"[১১]

উপন্যাসের পরতে পরতে যেমন স্বপ্ন, প্রেম ছড়িয়ে আছে সেরকমই বিশ্বাসভঙ্গ, স্বপ্নভঙ্গও সেরকমভাবে আছে। গুরুপদ ও কাননের স্বপ্ন ছিল তাদের ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে, বড় হয়ে তাদের জীবনের দুঃখ ঘোচাবে। কিন্তু, পল্টু পড়াশোনা না করে গ্রামে গুন্ডাগিরি করে বেড়ায়।

ইটভাটায় কাজ নিয়ে সেখানেও চুরি করে বেড়ায়। গ্রামের লোক তার ওপর অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে চুরির দায়ে ধরাও পড়ে, এর ফলে তার বাবা মায়ের মাথা হেঁট হয়ে যায় সবার সামনে। কিন্তু তাতেও তার শিক্ষা হয় না। শেষ পর্যন্ত সে চুরির দায়ে ধরা পড়ে জেল পর্যন্ত যায়। আবার অন্যদিকে, টুনি দিদিমণি গ্রামের ছেলে বিমলকে ভালবাসত। বিমল তার সাথে প্রেমের অভিনয় করত এবং যখন টুনির গর্ভে বিমলের সন্তান চলে এল তখন বিমল নিজের আসল রূপ দেখাল। বিমল টুনির দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করল, বাধ্য হয়ে টুনি নিজের গর্ভপাত করাল। এই গর্ভপাত শুধু টুনির সন্তানের নয়, বরং এক মেয়ের স্বপ্নের গর্ভপাত, তার ভালবাসার মৃত্যু। ইরাও স্বপ্ন দেখেছিল মঙ্গলকে নিয়ে, সেই মঙ্গলও কলকাতায় পড়াশোনা শিখে নতুন মেয়ের প্রেমে পড়ে। ইরাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে, এমনকি তার নতুন প্রেমিকাকে বিয়ে করে ইরার সামনেই তাকে গ্রামে নিয়ে আসে। ইরার বান্ধবী কমলার জীবনও খুব একটা সুখের ছিল না। সে পড়াশোনা জানা একজন শিক্ষিত মেয়ে, কিন্তু ভাগ্যচক্রে তার বিয়ে হয় এক অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে। আবার তার বাবা যথাযোগ্য পণ দিতে না পারার কারণে তার স্বামী তাকে কথায় কথায় অপমান করে। তার সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার করে। নিজের জীবনের প্রতি অল্পতেই সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। তার ওপর কমলাকে নিয়মিত মারধোর করত তার স্বামী গোবিন্দ।

"একটা অকাট চাষার সাথে বিয়ে হয়েছে তার। পাথরকে হৃদয় দিলে ভালবাসার মূল্য ফেরত পাওয়া যায় না। সিঁথির সিঁদুর তাকে অনেক সহ্য ক্ষমতা দিয়েছে। সিঁদুরের মর্যাদা দিতে সে এত দিন পড়েছিল মুখ বুজে।...কথায় কথায় বলত, তোর বাপ একটা জুচ্চোর। আমাকে ঠকিয়েছে। সোনা বলে রোল্ডগোল্ড বেঁধে দিয়েছে আমার গলায়। কমলা প্রতিবাদ করলেই হাত চলত এলোপাথাড়ি।"[১২]

জয়দেবের সঙ্গে ইরার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। ইরা কোনভাবেই জয়দেবকে বিয়ে করতে চায়নি। কিন্তু গরীবদের কথা আর কে শোনে, তার ওপর ইরা আবার একজন মেয়ে। সমাজে মেয়েদের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও জয়দেব ও ইরার বিয়ে হয়েই যায়। ইরার বাবা মা ভীষণ খুশি হয়, যদিও বিয়ের পর ইরাও জয়দেব কে পেয়ে খুব খুশি ছিল। একজন কর্তব্যনিষ্ঠ পত্নীর ন্যায় সমস্ত দায়িত্ব একা হাতে সামলাতো ইরা। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলেও তাদের দাম্পত্য মোটামুটি সুখেরই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় যে জয়দেবের চরিত্র মোটেও ভাল ছিল না। সে লরির ড্রাইভারি করত আর সেই সূত্রে তাকে কলকাতায় যেতে হতো। আর তখন রাস্তার মেয়েদের সঙ্গে সে অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতো, আর তার সাথে থাকত দেদার মদ্যপান। এসব কিছুই ইরা জানতে পারত না। কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডাবে কে? একদিন রাস্তায় মদের ঘোরে গাড়ি চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে এলেও সে যাত্রা তার দুটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তাদের আশ্রয় নিতে হয় ইরার বাপের বাড়িতে। কিন্তু, সেখানেও তাদের অবস্থান সুখকর হয় না। জয়দেব প্রথম জীবনে পূর্ববঙ্গে ছিল, সেখানে তার সাথে সাধনার বিয়ে হয়। কিন্তু চুরির অপরাধে জয়দেবের জেল হয়, সে সেখান থেকে পালিয়ে ভারতে চলে আসে। কিন্তু এতদিন পর জয়দেবের খোঁজ পেয়ে সাধনা তাদের একমাত্র ছেলেকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এদেশে চলে আসে। অন্ধ জয়দেবের সঙ্গে ইরার সম্পর্ক যে মুহূর্তে একটু একটু করে থিতু হচ্ছিল, সেই মুহূর্তে এমন সংবাদ তাকে একেবারে ভিতর থেকে টলিয়ে দেয়। জয়দেব সবার চোখে বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। জয়দেব সাধনাকে প্রাণে মারার চেষ্টা পর্যন্ত করে, কিন্তু সে সবার হাতে ধরা পড়ে যায়। সবার হাতে সে বেঁচে গেলেও

নিয়তি তাকে ক্ষমা করে না, একদিন মদের নেশায় চুর হয়ে পুকুরে ডুবে সে মারা যায়। শেষ হয়ে যায় একটি অধ্যায়।

"খবরটা শোনার পর থেকে তার গা পাক দিয়ে বমি এল বারবার। চোখ ফেটে জল এল। দেওয়ালে হাত ছুঁড়ে ভেঙে ফেলল শাঁখা। পলা। জোড়া চোখে আঁধার ঘনিয়ে এল তার। মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল সে।"[১৩]

ইরার দুঃখের এখানেও ইতি নয়। হয়তো, তাদের পুরো জীবন জুড়েই ভার করে থাকে দুঃখের মেঘ। জয়দেবের মৃত্যুর পর ইরার দুঃখ আরও দীর্ঘায়িত হয়, ইরার কন্যাসন্তান জন্মলাভ করে। এরকম স্বার্থপর পৃথিবীতে একাকী মেয়েকে নিয়ে বেঁচে থাকা, কোন লড়াই এর চেয়ে কম নয়। তার ওপর হাজারটা লোভাতুর দৃষ্টি সবসময় সুযোগের জন্য তাকিয়ে থাকে। বিপত্নীক মৃণাল ইরাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। ইরা সারাজীবন একা থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। আর সে জন্য ইরা ধনঞ্জয়বাবুর বাড়ি যায় কাজের সন্ধানে। কিন্তু, তিনি ইরাকে তাদের কলকাতার বাড়িতে চাকরের কাজ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন না। সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে ইরা যখন সে কাজেও সম্মত হয়ে যায়, তখন ধনঞ্জয় বাবু বলেন যে সেখানে ইরার মেয়ে বর্ষাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে ইরা সে শর্তও মেনে নেয়।

এক নিম্নবিত্ত মেয়ের লড়াই উপন্যাসের এই অংশে ফুটে উঠেছে। সে বারবার সমাজের কাছে, পরিবারে কাছে, নিজের কাছে হেরে যায়। কিন্তু, সে কখনও নিজের লড়াই থামায় না। সে মচকায় তবু ভাঙ্গে না। এক লড়াই থেকে পরের লড়াই করার মাধ্যমেই নিজেকে শক্ত করে। কারণ সে জানে, লড়াই করা ছাড়া এই কঠিন কঠোর পৃথিবীতে এক মুহূর্ত বাস করা সম্ভব না। উপন্যাসের

শেষে অনিল ঘড়াই কাননের মুখ দিয়ে গরীবের দীর্ঘকালীন বঞ্চনার ইতিহাসের কথায় যেন বলিয়ে নিলেন-

"আমি যদি তোকে ছেড়ে বাঁচতে পারি, তাহলে বর্ষাকে ছেড়ে তুইও বেঁচে থাকবি। যা মা, আর দেরী করিস না। কাননের শেষের দিকের কথাগুলো কান্নায় ডুবে গেল।"[১৪]

তথ্যসূত্র

১) অনিল ঘড়াই, ‘নীল দুঃখের ছবি’, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৩।

২) তদেব, পৃ. ২১।

৩) তদেব, পৃ. ২১।

৪) তদেব, পৃ. ২২।

৫) তদেব, পৃ. ৪৩।

৬) তদেব, পৃ. ৩০।

৭) তদেব, পৃ. ৬৪।

৮) তদেব, পৃ. ৭২।

৯) তদেব, পৃ. ৯০।

১০) তদেব, পৃ. ১০০।

১১) তদেব, পৃ. ১৫৬।

১২) তদেব, পৃ. ১৮৫।

১৩) তদেব, পৃ. ২১৩।

১৪) তদেব, পৃ. ২২৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজোয়ার বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ‘অনন্ত দ্রাঘিমা’: নিম্নবিত্তের জীবনে বিপ্লব

অনিল ঘড়াই এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ তথা বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি হল ‘অনন্ত দ্রাঘিমা’। উপন্যাসটি ২০০৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে ‘বঙ্কিম সাহিত্য পুরস্কার’-এর সম্মানে ভূষিত হয়। পুরস্কার পাওয়ার সাথে সাথে অনিল ঘড়াই বাংলা পাঠক মহলে এক পরিচিত নাম হয়ে ওঠেন, যদিও তিনি এর অনেক আগে থেকেই নানা ধরনের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস পাঠকদের উপহার দিয়েই এসেছেন। অনিল ঘড়াই নিজে জাতিতে ছিলেন হাড়ি, নিম্নবর্ণের মানুষ হওয়ার জন্য সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জীবনশৈলী, আচার-আচরণ, রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। এছাড়া নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি নানা ধরণের ‘বর্ণগত’ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, যার প্রভাব বা প্রতিচ্ছবি পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় নানাভাবে, নানা মাত্রায় পাঠকের কাছে তিনি উপস্থিত করেছেন। অনিল ঘড়াই পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ারিং করেন এবং রেলের ইঞ্জিনিয়ার পদে যোগদান করেন, তিনি কর্মসূত্রে খড়গপুর এলাকায় থাকতেন এবং জন্মসূত্রেও মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন। এর ফলে তিনি মেদনীপুর অঞ্চলের আদিবাসী, নিম্নবিত্ত মানুষদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন, তাদের আদব-কায়দা, রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এসবেরই প্রভাব পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় পড়েছে।

সাধারণত নিম্নবিত্ত, আদিবাসীদের নিয়ে সাহিত্যচর্চায় একটা সমস্যা থেকেই যায়। যেটা নিয়ে আজও তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ লেগেই আছে। নিম্নবিত্তদের নিয়ে যারা সাহিত্য রচনা করেছে তারা কারা? অর্থাৎ তাদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা বা তাদের বিশ্লেষণ কতটা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য? কিন্তু অনিল ঘড়াই-এর ক্ষেত্রে সেরকম কোন সমস্যাই নেই, কারণ লেখক নিজেই ছিলেন তাদেরই দলের একজন। স্বভাবতই তাঁর লেখা অনেক বেশি সত্যের কাছাকাছি, অনেক বেশি বিশ্লেষণধর্মী।

অনিল ঘড়াই তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই নিম্নবিত্ত, আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, প্রথা ইত্যাদির কথা তুলে এনেছেন, 'অনন্ত দ্রাঘিমা'-ও তার ব্যতিক্রম নয়। মূলত উপন্যাসটির মধ্যে তিনি নদীয়ায় ঘটা 'রাজোয়ার বিদ্রোহের' কথা বলেছেন। উপন্যাসের মূল চরিত্র রঘুনাথ রাজোয়ার, যদিও সেরকমভাবে উপন্যাসে কেউই কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। গল্পের প্রয়োজনে নানা চরিত্র এসেছে সময়ে সময়ে। অনিল ঘড়াই 'রাজোয়ার' সম্প্রদায়ের মানুষজনদের জীবিকা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। গুয়ারাম রাজোয়ার গ্রামে কাজ না থাকার জন্য বর্ধমানে যায় ধান কাটতে, দীর্ঘ সময় ধরে সে গ্রামে অনুপস্থিত থাকে। তার ছেলে রঘুনাথ রাজোয়ার সবচেয়ে অদ্ভুত চরিত্র, সে কখনও কোন কাজ নির্দিষ্ট ভাবে করেনা। কখনও গ্রামে তার দাদু চুনারামের সাথে ক্ষেতি করতে যায়, আবার কখনও সে সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে তার বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলতে চলে যায়। কখনও আবার বৃদ্ধ গিয়াসের সাথে খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করতে নেমে পড়ে, আবার কখনও সে তার কাকা ডাকাত লুলারামের দলে যোগ দেয় ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে- শুধুমাত্র পেটের দায়ে। চুনিরামের ভাই মুনিরাম ছিল জন্ম ডাকাত, তার শরীরে কোন দয়ামায়া ছিলোনা, ঘোড়া ছুটিয়ে সে ডাকাতি করতে যেতো। গরীব মানুষের টাকা লুঠ করতেও সে পিছপা হত না,

যদিও চুনারামের মতে সে এইসব পাপের ফল ভোগ করছে কারণ বৃদ্ধ বয়েসে তার সারা গায়ে কুষ্ঠ রোগে ছেয়ে গেছে, গ্রাম থেকে সে একঘরে হয়েছে। পরবর্তীকালে চুনারামের ছেলে লুলারামও বাবার দেখানো পথে অর্থাৎ ডাকাতিতে যোগ দেয়। উপন্যাসটি নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ, বেথুয়া, পলাশি এইসব অঞ্চলে বসবাসকারী 'রাজোয়ার' উপজাতিদের নিয়ে গড়ে উঠেছে, কিন্তু অনিল ঘড়াই উপন্যাসের মধ্যে একটা বৃত্ত নির্মাণ করেছেন। যেখানে রাজোয়ার ছাড়াও সমাজের পিছিয়ে পড়া বিত্তহীন শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি জমিদাররা একই সাথে বাস করে।

অনিল ঘড়াই উপন্যাসের মধ্যে মানুষের অবস্থানের মাধ্যমেই সুন্দর ভাবে সমাজে আদিবাসীদের অবস্থান স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'রাজোয়ার'-রা গ্রামের এক কোণে বসবাস করে, যেখানে সাধারণত অন্যরা যায় না। আবার সমাজের যারা বিত্তহীন, তারা গ্রামের হাসপাতাল-কে কেন্দ্র করে তাদের সংসার গড়ে তোলে। জমিদার নীলাক্ষবাবু থাকেন সবার থেকে আলাদাভাবে। আবার হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। আর তাই তিনি সুযোগ পেলেই সে সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে ভোলেন না।

উপন্যাসটির মধ্যে অনিল ঘড়াই ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে সমগ্র বিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আর তাই, গল্প কখনও একমুখী হয়ে উঠেনি, তিনি উপন্যাসের মধ্যে যেমন 'রাজোয়ার'-দের জীবন, দুঃখ, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের ছবি এঁকেছেন তেমনি একইসাথে সমাজের বিত্তহীন মানুষদেরও দেখিয়েছেন। ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে তিনি আদিবাসীদের উপর অত্যাচারের দিকটি স্পষ্ট করেছেন। পুকুর থেকে সামান্য নালফুল তোলার অপরাধে জমিদার নীলাক্ষবাবু অসহায় চুনারাম ও রঘুনাথকে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করে,

"আজ পুকুরে নালফুল তুলছে, কাল সুযোগ পেলে মাছ ধরবে। এটা কি মামার বাড়ি? যা খুশি তাই করবে।"[১]

পরবর্তীকালে এই অত্যাচারী নীলাক্ষ বাবু আবার পাঁঠা চুরির অপরাধে গুয়ারামকে থামের সাথে বেঁধে চাবুক মারে, যদিও সে ক্ষেত্রে গুয়ারামের কোন অপরাধ ছিল না, কারণ সেই পাঁঠাটিকে সবাই অন্য জায়গা থেকে উদ্ধার করেছিল। এই মার ও অপমান সহ্য করতে পারে না গুয়ারাম, সে শরীরে যক্ষ্মা রোগ বাঁধিয়ে অকালেই মারা যায়।

অনিল ঘড়াই এর উপন্যাসের মধ্যে যে জিনিসটি বারবার করে ফিরে ফিরে আসে সেটি হল- পরকীয়া প্রেম। নানা জটিল ও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় তার সৃষ্ট চরিত্র দের। এই উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও সম্পর্কের জটিলতা ও পরকীয়া সম্পর্কের ছড়াছড়ি। ডাকাত লুলারাম তার স্ত্রী ঢিলি কে ছেড়ে মজে থাকে ভিকনাথের স্ত্রী ঝারির সৌন্দর্যে। লুলারাম স্বপ্ন দেখে ঝারিকে নিয়ে সে একদিন এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু নিজের দুটি মেয়ের কথা ভেবে সে এগোতে পারেনা। অন্যদিকে, ভিকনাথ সমস্ত ব্যাপার জেনেও চুপ করে থাকে নিজের ব্যর্থতায়। সেও সুযোগ খোঁজে লুলারামকে শায়েস্তা করার জন্য। এদিকে, লুলারামের স্ত্রী ঢিলি তার স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের কথা জানতে পেরে ঘর ছেড়ে চলে যায়, যদিও কিছুদিন পর তাকে অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় উদ্ধার করে রঘুনাথ এবং তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু, নিজের দুঃসহ জীবন ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ঢিলি একদিন নিজের ঘরেই আত্মহত্যা করে। এ আত্মহত্যায় যদিও লুলারাম খুশিই হয়,

"সাতদিন পরে এ কি বিপদ! লুলারাম কপাল চাপড়ে কেঁদে উঠল। এ কান্না লোক দেখানোর কান্না।"[২]

ভিকনাথও আবার লুলারামকে মারার জন্য সে সুফল ওঝার সঙ্গ নেয়, তার শেখানো গুপ্ত মন্ত্রে সে যাতে লুলারামকে জব্দ করতে পারে। আর এই সুযোগে সুফল ওঝাও নিজের সমস্ত কাজ ভিকনাথকে দিয়ে করিয়ে নেয়। সুফল ওঝা নিজের হাতযশের কারণে অনেক কাঁচা টাকার মালিক, আর সেই জন্য সে সমাজের নিচু লোকেদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। এই সুফল ওঝা চরিত্রটি নির্মাণের মাধ্যমে অনিল ঘড়াই সমাজের মধ্যে ঘটে চলা পরিবর্তনকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাঁচা টাকা হওয়ার ফলে কিছু মানুষ নিজেদের ভিত্তি ভুলতে বসেছিল, সুফল ওঝা হল তাদের প্রতিনিধি। দুলু কাহার ভালোবাসতো মনোয়ারাকে, মনোয়ারাও দুলুকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু বাধসাধল নিয়তি। হঠাৎ একদিন কারখানার চাকায় দুলু কাহারের হাত ঢুকে গেল, বাদ পড়ল তার ডান হাত। হাত কাটা দুলুকে বিয়ে করতে এবার রাজি হল না মনোয়ারা, এখন ভালোলেগেছে পয়সাওয়ালা সাদাতকে। সে সাদাতকে বিয়ে করে, কিন্তু দুলু তাকে ভুলতে পারে না, আর তাই সে বারবার মনোয়ারার পিছন নেয়,

"দুলু তাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, তুমি যে বলতে আমার সাথে সাদী না হলে মরে যাবে- এ সব কি মিছে কথা? বলো? চুপ করে থেকো না। আজ তুমাকে বলতেই হবে।"[৩]

কিন্তু ধূর্ত মনোয়ারার দুলুর কাছে ফেরার আর কোন ইচ্ছা নেই, সে এখন নিজের বাপকেই আর পাত্তা দেয় না, আর তাই সে বলে,

"তখন তোমার দু-হাত ছিল, এখন ডান হাতটাই কাটা। এক হাত নিয়ে যে নিজেকে পুষতে পারে না, ভিখ মেঙ্গে খায়- সে আবার আমারে পুষবে কি করে?"[৪]

সমাজের অভ্যন্তরে এরকম সুযোগসন্ধানী চরিত্র হিসাবে মনোয়ারার জুড়ি মেলা ভার। যদিও এরকমই আর একটি চরিত্রের কথা পাওয়া যায়, গিয়াসের বউ নাফিজা। গিয়াসও সারাদিন ব্যস্ত

থাকে খেজুর এর রস সংগ্রহে, আর তাই সে ঠিকঠাক সময় দিতে পারেনা নাফিজাকে। আর সেই সুযোগে নাফিজা গিয়াসের প্রতিদ্বন্দ্বী মকবুলের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে তোলে। একদিন সেই সম্পর্ক গিয়াসের চোখে পড়ে যায়, যদিও সে যাত্রায় নাফিজা গিয়াসের হাতেপায়ে ধরে মাফ চেয়ে নেয়, গিয়াস সব কিছু মেনেও নেয়। কিন্তু, যে সম্পর্ক টেকার নয় সেটা জোর করে টেকানোও যাবে না, আর তাই একদিন ভোর ভোর নিজের কোলের ছেলেকে ফেলে রেখে নাফিজা মকবুলের সাথে পালিয়ে যায় কোলকাতায়, নতুন স্বপ্নের খোঁজে। আদিবাসী সম্পর্কের জটিলতা, তাদের মানসিক টানাপড়েন এখানে অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে। মকবুলের চিঠিতে ফুটে উঠেছে প্রতিশোধস্পৃহার ছবি,

"বদলা নিলাম। আমার নাম মকবুল। বদলা নিতে আমার কোনদিন ভুল হয় না। তোর সুন্দরী বউ নাফিজাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে আমি কলকাতায় চললাম। আর এ গাঁয়ে আসবো নি। তোর ছেলেটাকে তোর কাছে দিয়ে গেলাম। ও কাছে থাকলে নাফিজা কোনোদিনও আমার হত না। টা-টা বাই-বাই।"[৫]

নিম্নবর্গদের নিয়ে 'সাধারণ' মানুষদের যে বিশ্বাস সেখানে অনিল ঘড়াই কুঠারাঘাত করেছেন, সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাদেরও যে একটা মন আছে, সেটাই সবাই ভুলে যায়। তাদের জীবনে হাজারটা সমস্যা আছে, অভাব আছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বাঁচতে চায়, স্বপ্ন দেখতে চায়। নতুন করে প্রেমে পড়তে চায়, নতুন সকালের উদয় দেখতে চায়। বারবার প্রেম, বিশ্বাস, সম্পর্কের জটিলতা দেখিয়ে অনিল ঘড়াই এখানে মানুষের মনের সূক্ষ্ম ভাবনার স্তরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। আর একটা বিষয়, আদিবাসীরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে কেউ কেউ কলকাতা তে চলে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চেয়েছে, যেমন- মকবুল ও নাফিজা, আবার অন্যদিকে নীলকণ্ঠের প্রস্তাবে সাড়া না

দিয়ে ভূষণী এই গ্রাম কেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে, আর তার মুখ থেকে তাই লেখক হয়ত বলিয়ে নিয়েছেন

"এ মাটি ছেড়ে আমি কুথাও যাবনি। ইখানেই বাঁচব, ইখানেই মরব। এত সুখ এই দেশছাড়া আর কুথায় পাবো।"[৬]

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এইসব আদিবাসীদের মধ্যেও এই ধরণের টানাপড়েন চোখে পড়ে, একদল চেয়েছিল নিজের ভিটে-মাটি তেই জীবিকা নির্বাহ করতে, নিজের মাটিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে। আর অন্যদল চেয়েছিল সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শহর কলকাতা তে চলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে, কারণ সেখানে জীবিকার অনেক নতুন দিশা মিলবে। আদিবাসীদের মধ্যে এই টানাপোড়েন লেখক অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরা আদিবাসীদের ভালোমানুষির সুযোগ নিত, তাদেরকে যথেচ্ছভাবে নিজেদের কাজে লাগাত এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে যথাসময়ে ত্যাগ করত, তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল নীলকণ্ঠ। তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে চলে যায়, আর সে জন্য সারাদিন মদে ডুবে থাকতো। আর সেই সূত্রে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় আদিবাসী মেয়ে দয়ালের স্ত্রী ভূষণীর সাথে। একদিন যখন সে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরছিল, তখনি ঘটে গেল বিপদ,

"নীলকণ্ঠের কথা জড়িয়ে গেল, সে টলে পড়ল ভূষণীর উপর, আমাকে ধর। ঠেকা দে।

-ঘর যাও বাবু।

-কার জন্য ঘর যাবো বল? সেখানে কে আছে আমার?

-কেনে তুমার বউ!

-তার মুখে লাথি মারি। সে আমার মুখে লাথি মেরে চলে গিয়েছে।"[৭]

অর্থাৎ নিজের হতাশা, ব্যর্থতার বোঝা সে অন্যের ওপর চাপাতে চায়। নিজের কষ্টের কথা বলে সে অন্যের সমবেদনা আদায় করতে চায়। তার দুঃখের কথা শুনে ভূষণীও নরম হয়ে পড়ে এবং শেষে সে নিজেকে সমর্পণ করে নীলকণ্ঠের হাতে। নীলকণ্ঠও যথারীতি ভূষণীকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়,

"আমি তোকে ঠকাব না রে,তুই চাইলে আমি সব ফেলে তোকে নিয়ে পালিয়ে যাবো।"

ভূষণীও নীলকণ্ঠকে জিজ্ঞেস করে,

"কিছু হয়ে গেলে তার দায় তুমি নেবে তো বাবু? ধোঁকা দিবেনি তো?"[৮]

এর পরে আর কিছু বলা চলে না, ভূষণী মিলিত হয় নীলকণ্ঠের সাথে। কিন্তু ভবিতব্যকে কে পাল্টায়, আদিবাসীদের জীবনে সবচেয়ে বেশি যেটা ঘটে এখানেও সেটা ঘটে যায় –'প্রতারণা'। ভূষণী গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার পর একদিন নীলকণ্ঠও নিরুদ্দেশ হয়। কিন্তু ভূষণী হার মানে না, সে একাই সমাজের সাথে লড়ে জন্ম দেয় নীলকণ্ঠের ছেলে দুলালকে। অনিল ঘড়াই 'নীলকণ্ঠ-ভূষণী'-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আদিবাসী সমাজের ওপর ঘটে চলা দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা বলতে চেয়েছেন, একই সাথে আবার আদিবাসীদের হার না মানা লড়াই এর মানসিকতা ও সেই সময়ে দাঁড়িয়ে 'একক মাতৃত্বের' মতো সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো বিষটিকেও স্পষ্ট করে তুলেছেন। আবার একই সাথে তথাকথিত 'বাবু'-দের চূড়ান্ত কাপুরুষতা কে সবার সামনে এনে তাদের অবস্থান সমাজে স্পষ্ট করেছেন।

আদিবাসী সমাজের মধ্যে জমে থাকা অজস্র কুসংস্কার, বিশ্বাস, ভণ্ডামির অনেক নিদর্শন উপন্যাসের পরতে পরতে লেগে আছে, আর এই গরীব নিম্নবর্ণের মানুষদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে একদল

মানুষ নিজেদের ফায়দা তোলে, সেরকমই একটি চরিত্র হল সুফল ওঝা। সেও একসময় বাকিদের মতো গরীব ছিল, কিন্তু ওঝাগিরি শিখে সে মানুষের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে প্রচুর কাঁচা টাকা জমিয়ে ফেলে। আর তার ফলে সে নিজেকে বাকিদের থেকে আলাদা ভাবতে শুরু করে, গরীব রাজোয়াররা তাকে প্রায় ভগবানের পর্যায়ে নিয়ে যায়। গ্রামের কোথাও কোন সমস্যা হলে সে মাতব্বরের মতো নিদান দেয়, আর শুধুমাত্র এই অহংকারের জন্যই সে নিজের মেয়ে কমলার বিয়ে গরীব রঘুনাথের সাথে দিতে চায় না। সুফল ওঝার এই ক্ষমতার জন্য তার ছেলে কাশীনাথ পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে গ্রামের মধ্যে গুন্ডাগিরি করে বেড়ায়। নিজের ছেলেকে পর্যন্ত সুফল ওঝা মন্ত্রের জোরে পরীক্ষায় পাশ করাতে চায়,

"এই মাদুলি শরীরে ছুঁয়ে থাকলে সব পড়া তোর হড়হড়িয়ে মনে পড়ে যাবে। এই মাদুলির নাম-বিদ্যাদেবী সরস্বতী মাদুলি। বৃহস্পতিবারে তুই এটাকে ধারণ করবি। ধারণের দিন নিরামিষ খাবি।"[৯]

যদিও যথারীতি সব কিছু পালন করেও কাশীনাথ পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনা। ভিকনাথ তার কাছে সাহায্য নিতে আসলে সুফল ওঝা নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চায়, সে রঘুনাথকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়, যথারীতি তার দেওয়া হুমকিতে ভিকনাথ ভয় পায়। ভিকনাথ তার কাছে সাহায্য চায়তে যায় কারণ সে তার স্ত্রী ঝারি ও লুলারামের সম্পর্ক মেনে নিতে পারছিলনা, আবার কিছু করতেও পারছিল না। তাই অগত্যা সুফল ওঝার সাহায্য নেওয়া। কিন্তু অন্যদিকে রঘুনাথ তার মেয়ে কমলাকে বিয়ে করতে চায়, তাই সুফল ওঝা এই সুযোগে ভিকনাথকে দিয়ে পথের কাঁটা রঘুনাথকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। সমাজের চারিদিকে এরকম হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ, সুযোগসন্ধানী মানুষের অভাব নেই। তারা যেখানেই থাকে সেখানেই নিজের সুবিধার জাল বিস্তার করে। গরীব মানুষদের ঠকাতে তাদের একটুও বুক কাঁপে না। আর তাই, এখানে সুফল ওঝার

মাধ্যমে লেখক অনিল ঘড়াই যেন এক লহমায় পাঠকদের সামনে সেইসব চরিত্রদের নিয়ে আসলেন। বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসে তাই সুফল ওঝা একটি জ্বলন্ত চরিত্র।

প্রত্যেক সমাজেই সবার ওপরে এমন একজন বসে থাকে যে সবার অলক্ষ্যে থেকে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখে, সেরকমই একটি চরিত্র হল জানগুরু। এককথায় এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাজোয়ার এলাকায় শুধুমাত্র বুজরুকি, ধাপ্পাবাজির মাধ্যমে জানগুরু সমাজের একপ্রকার মাথা হয়ে উঠেছে। জানগুরু আবার সুফল ওঝারও গুরু, আর তাই যখন সুফল ওঝা ভিকনাথের স্ত্রী ঝারির কাছে একপ্রকার পাত্তা না পেয়ে অপমানিত হয় তখন সে ঠিক করে ভিকনাথকে সে ভাতে মারবে। আর তাই সে জানগুরুর সাথে পরামর্শ করে রটিয়ে দেয় যে ভিকনাথ ও ঝারির বাড়িতে ভুত আছে। কুসনস্কারাছন্ন গ্রামবাসীর সেটা বিশ্বাস করতে সময় লাগেনা, আর সেই সুযোগে জানগুরু সমাজের ভয় দেখিয়ে ভোগ করে ও তাকে গর্ভবতী বানায়। নিঃসন্তান ঝারির প্রথমে আপত্তি থাকলেও শেষে সেও তাতে সম্মতি দেয়,

"ঝারি পা আলগা করে শুয়ে আছে আঁধারে, জানগুরু পা দিয়ে উল্টে দেয় ডিবরিটা। কেরোসিনে ভিজে যেতে থাকে মেঝে। চেনা গন্ধ। এ গন্ধ কি শুধু কেরোসিনের?"[১০]

অনিল ঘড়াই এর অসামান্য কাব্যিক বর্ণনায় এই প্রসঙ্গটি উপন্যাসে অন্য মাত্রা পায়, আর একই সাথে উপন্যাসের নখদন্তযুক্ত জানগুরু যেন বাস্তবের চরিত্র হয়ে পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়, এখানে অনিল ঘড়াই এর বর্ণনা লক্ষ্য করার মতো,

"গৌরচন্দ্র ধুতি সামলে বলে, মুখের ঘাম মুছে লে। তোর শরীরের ভূত আমি আমার নিজের শরীরে পুরে নিয়েছি। আজ থিকে তুরে আর এট্টা ভূত তাড়াবে। সে তুরে মা-মা বলে ডাকবে, কেউ জানবে না, শুধু তুই জানবি- সে ভূতটার বাপ গৌরচন্দ্র জানগুরু। একথা দুকান হলে তোরে আবার ভূতে ধরবে।"[১১]

সমস্ত ব্যপারটার মধ্যে একটা অসামান্য রূপক আছে, এখানে জানগুরু হল উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি, আর ঝারি নিম্নবিত্তের। নিম্নবিত্তরা এমনিতেই অত্যাচারিত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তারা সুখে থাকার চেষ্টা করে তাহলেও সমাজের ওপরতলার লোকেরা সেটা হতে দেয় না। তারা এসে শোষণ করবেই, আর একপ্রকার জোর করেই তারা নিজেদের অত্যাচারের বীজ আদিবাসী তথা নিম্নবিত্তদের ভিতর পুঁতে দেবে, যেমনভাবে জানগুরু তার সন্তানের বীজ পুঁতে দিয়েছিল ঝারির গর্ভে।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হল কপোতাক্ষ। তিনি গ্রামের জমিদার অত্যাচারী নীলাক্ষবাবুর ভাই। দুজনে আপন ভাই হওয়া সত্ত্বেও দুই ভিন্নমেরুর বাসিন্দা। কপোতাক্ষ সক্রিয় রাজনীতি করে, তার আন্দোলন প্রধানত নিম্নবিত্তদের হয়ে সমাজের উচ্চবিত্তদের পক্ষে। এখানে অনিল ঘড়াই উপন্যাসের মধ্যে একদম নতুন মাত্রা যোগ করলেন। একজন উচ্চবিত্তের 'বাবু' লড়াই করছেন সমাজের 'নীঁচু' তলার লোকেদের জন্য। তিনি সমস্ত অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, আর তাই ধাওড়াপাড়ার লোকেরা তাকে খুব সম্মান করে। তিনি নিম্নবিত্তদের মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে চান, তাদের নিজেদের প্রাপ্য মর্যাদা তিনি ফিরিয়ে দিতে চান। আর তার এই অবস্থানের জন্য তার ভাই নীলাক্ষবাবু তাকে সহ্য করতে পারেনা, সমস্ত সম্পত্তি থেকেও তাকে বঞ্চিত করে। কপোতাক্ষ বাবুই ছিলেন প্রথম যিনি নিরপরাধ গুয়ারামকে নীলাক্ষবাবুর চাবুকের হাত থেকে রক্ষা করেন। আর এই আন্দোলনে কপোতাক্ষবাবু পাশে পেয়েছেন 'বিদুর রাজোয়ার' ও 'লাবণি রাজোয়ার'-কে। এই চরিত্র দুটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অনিল ঘড়াই উপন্যাসে অন্য মাত্রা দিয়েছেন। বিদুর রাজোয়ার নিজে একজন নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি, কিন্তু সে সবদিক দিয়ে সচেতন, নিম্নবিত্তের প্রাপ্য মর্যাদা ছিনিয়ে নিতে সে বদ্ধপরিকর। ছোট বেলা

থেকেই বিদুর অভাব, অসাম্য আর বর্ণবৈষম্যের শিকার। তার বাবা রামায়ণ ছিল খেতমজুর, আর সে মুখে মুখে বাবুদের সাথে তর্ক করত, যেটা বাবুদের সহ্য হয়নি। আর তারফলে তাকে একঘরে করে দিয়ে তারা একপ্রকার মেরে ফেলে। এরফলে ছোট্ট বিদুরের মনে মনে ক্ষোভ জমছিল। বড় হওয়ার পর সে কপোতাক্ষবাবুর সাথে যোগ দেয় সক্রিয় রাজনীতিতে, গড়ে তুলতে চায় সচেতনতা,

"ততদিনে বিদুরের মনের ভিতর ভূমিকম্প ঘটে গিয়েছে। লাঙল যার জমি তার কথাগুলো উড়ে এল বিভিন্ন গ্রাম থেকে। পৃথিবীর সংগ্রামী মানুষ সব এক হও। জোতদারের কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও। ইন কিলাব জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ।"[১২]

বিদুরের চেহারার মধ্যেই একটা প্রতিবাদ আছে, আবার অন্যদিকে লাবণিও নিজের জীবনের সঙ্গে লড়াই করছে। সে জন্মগতভাবে রাজোয়ার নয়, সে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু একদিন ফেরার পথে রাস্তায় তাকে কয়েকজন আততায়ী ধর্ষণ করে। ধর্ষিত হওয়ার পর তার মনের জেদ আরও বেড়ে যায়, সে একা থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু অনিল ঘড়াই এখানেই ঘটিয়ে দেন এক যুগান্তকারী ঘটনা। লাবণিকে বিদুর বিয়ে করে নেয়। এই ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও মোটেও সাধারণ নয়। একজন হিন্দুর একজন নিম্নবিত্ত আদিবাসীকে সমাজের লাল চোখকে উপেক্ষা করে বিয়ে করার মধ্যে একটা বিদ্রোহ ছিল, একটা নতুন সকালের আভাস ছিল। আদিবাসীরাও সচেতন হচ্ছে, আর তারা মুখবুজে অত্যাচার সহ্য করবে না, প্রতিরোধ করবে এবং দরকার পড়লে তারা আন্দোলনের পথে যাবে, সশস্ত্র বিপ্লবের রাস্তায় হাঁটবে। আর যেখানে সমাজের উঁচু তলার মানুষজন আদিবাসীদের ছোঁয়া জিনিস খায় না, সেখানে একজন হিন্দু মেয়ের এক দলিত 'রাজোয়ার'-কে বিয়ে করার মাধ্যমে লেখক যেন শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাসের ওপর সরাসরি আঘাত হানলেন। উপন্যাসের আর একটি প্রতিবাদী চরিত্রের সন্ধান পাঠক পায়, সে হল

গ্রামের জমিদার নীলাক্ষবাবুর ছেলে রুদ্রাক্ষ। জমিদার নীলাক্ষবাবু অত্যন্ত অত্যাচারী হওয়া সত্ত্বেও তার ছেলে রুদ্রাক্ষ কি করে যে অত বড় মনের মানুষ হল সেটাই ভাবনার বিষয়, হয়ত এর পিছনে তার কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করার একটা ভুমিকা আছে। সে কলেজে পড়তে কলকাতা যায়, সেখানে নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরে বামপন্থী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় ও সমাজের উঁচুতলার লোকেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। তার লড়াই সরাসরি শুরু হয় তার বাবা নীলাক্ষর বিরুদ্ধে, আর তাই তাকে তার বাবা সহ্য করতে পারেনা। নিজের কাছে বন্দুক রাখার অপরাধে পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খোঁজে, এমনকি নিজের অসুস্থ মাকে পর্যন্ত তাকে দেখতে আসতে হয় রাতের অন্ধকারে, লুকিয়ে চোরের মতো নিঃশব্দে। অনিল ঘড়াই হয়ত রুদ্রাক্ষের মাধ্যমে ‘নকশাল’ আন্দোলনের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। তার এই আদর্শ যে ফাঁকা আওয়াজ শুধু নয় তা বোঝা যায় যখন মিথ্যে অভিযোগে গুয়ারামকে নীলাক্ষবাবু চাবুক পেটা করে এবং তার জন্য গুয়ারাম মারা যায়। রঘুনাথ বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর, আর সেসময়েই তার সাথে দেখা করতে আসে রুদ্রাক্ষ। রঘুনাথ রুদ্রাক্ষকে উচিত শিক্ষা দিতে চায়, সে বলে ওঠে ‘আজ এই মৃত্যুর জন্য তুমার বাবা দায়ী। সে আমার বাপের বুকে জোড়া পায়ের লাথি মেরেছিল।’ কিন্তু রুদ্রাক্ষ ভয় পায়না, সে বলে ওঠে, ‘মরতে আমি ভয় পাই না। এসেছি যখন একবার তোমার মায়ের সাথে দেখা করে যাব। বাবার হয়ে ক্ষমা চেয়ে তার পাপের ভাগ আমি কিছুটা কমাতে চাই।’

এখানেই রুদ্রাক্ষ চরিত্রটি অন্য মাত্রা পায়, উচ্চবিত্তের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে যথার্থ মানবিকতার বীজ, তাদেরও সংগ্রাম সর্বহারাদের নিয়ে, ‘নিজের কষ্ট দূর করার জন্য আমার এই সংগ্রাম আমৃত্যু চলবে।’ আর তাই বলা যায়, নিম্নবিত্তরা শোষিত হতে থাকবে; কিন্তু তাদের মধ্যেও কেউ কেউ রুখে দাঁড়াবে, প্রতিবাদ করবে, নতুন সকালের প্রতীক্ষা করবে আর স্বপ্ন দেখবে।

উপন্যাসের মধ্যে অনিল ঘড়াই প্রায় সমান্তরাল দুটি চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন- সূর্যাক্ষ ও শুভ। দুজনেই মধ্যবিত্তের ছেলে, আর দুজনেই স্বপ্ন দেখে পড়াশোনা করে বাবা মায়ের কষ্ট দূর করার। সুর্যাক্ষ কপোতাক্ষবাবুর ছেলে, তাই তার মধ্যে তার বাবার আদর্শের প্রতিফলন চোখে পড়ে। তার মধ্যেও তাই কোনোরকম উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ নেই, সে অবলীলায় মিশতে পারে 'রাজোয়ার' রঘুনাথের সঙ্গে। সে রঘুনাথের সঙ্গে তাদের পাড়ায় যায়, তারা এক সাথে ফুটবল খেলে। সুর্যাক্ষ দ্বীপী কে মনে মনে মনে ভালবাসে, কিন্তু প্রকাশ করতে ভয় পায়। অল্পবয়সেই সে জীবনটা অনেক গভীরে গিয়ে দেখেছে, আর তাই হয়ত সে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত। অন্যদিকে শুভ প্রায় সূর্যাক্ষের সমবয়সী। সেও রঘুনাথের বন্ধু, পড়াশোনায় ভালো, সেও স্বপ্ন দেখে পড়াশোনা করে চাকরি করে বাবা মায়ের দুঃখ দূর করবে। শুভর বাবা হাসপাতালে ঝাড়ুদারের চাকরি করে, এর ফলে অতি সামান্যই বেতন পায়। এজন্য তাদের বাড়িতে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা লেগেই থাকে। অনিল ঘড়াই এখানে ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে নিম্ন-মধ্যবিত্তের আর্থিক সঙ্কটের কথা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। মাসের প্রথম দিনেই অবনীকে পুরো মাসের খরচের হিসাব কষে নিতে হয়। আর এই টাকা নিয়ে মাঝেমধ্যেই অবনী ও সরস্বতীর মধ্যে ঝামেলা লেগেই থাকে। সরস্বতী আদতে শান্ত স্বভাবের, কিন্তু অল্পতেই তার মাথায় আগুন লেগে যায় এবং সে অবনীর সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। অবনীও মাঝে মাঝে সরস্বতীর হাত থেকে মুক্তি চায়, আর এই সুত্রেই মনের কোন এক দুর্বলতায় সে জড়িয়ে পড়ে পদ্মের সাথে। পদ্মকেও তার স্বামী ছেড়ে চলে গেছে কোন এক অজানা কারণে। অবনী ও পদ্মের এই সম্পর্কের কথা অবশ্য সরস্বতী জেনে যায়, কিন্তু সেও চুপ করে থাকে। নিম্নবিত্তের জীবনের এই ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন এই ছোট্ট পরিবারের মধ্য দিয়ে অসামান্য দক্ষতায় পাঠকের সামনে পরিবেশিত হয়েছে। 'মন' যে এক জটিল দুর্ভেদ্য জিনিস,

তাকে বোঝা বড় সোজা জিনিস নয়, নিম্নবিত্ত মানুষদেরও যে এরকম মন থাকতে পারে সেটাই যেন সবাই ভুলতে বসেছে, তারাও প্রেমে পড়তে পারে, নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারে- এই সহজ সত্যিটাকেই হয়ত অনিল ঘড়াই আবার মনে করিয়ে দিলেন। টুকরো টুকরো কিছু ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে অনিল ঘড়াই এইসব খেটেখাওয়া মানুষদের সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। শুভ যে ইস্কুলে পড়ে সেখানে হলদিপোঁতা হাসপাতালের প্রধান ডাক্তারের মেয়েও পড়ত। কিন্তু ইস্কুলের পরীক্ষায় শুভ তার থেকে বেশি নম্বর পাওয়ায় ডাক্তারবাবু মোটেও খুশি হন না, এমনকি শুভ যাতে কম নম্বর পায় ও তার মেয়ে যাতে বেশি নম্বর পায় সে জন্য তিনি মাস্টারমশাইকে পর্যন্ত অনুরোধ করেন,

"অবনী এই হাসপাতালের ঝাড়ুদার। শুভর কাছে মাধুরী যদি পিছিয়ে পড়ে সেটা কখনও ভালো দেখায় না। আমার মান সম্মান নিয়ে টানা হিঁচড়া হয় তাহলে। তাই বলছিলাম- একটু যদি এদিক ওদিক করা যেত, তাহলে মনে হয় সাপও মরত, আর লাঠিও ভাঙত না।"[১৩]

সমাজের এক নিচুতলার লোক হঠাৎ করে যদি নিজের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে তাহলে উঁচুতে যিনি বসে আছেন সেটা তিনি হতে দেন না, আর এই একই জিনিস এখানেও ঘটে। উচ্চবিত্ত সবসময় নিম্নবিত্তদের পায়ের নীচে রাখতে চায়, কারণ তাদের সবসময় নিজেদের ক্ষমতা হারানোর ভয় থাকে। আর তাই যখন অবনী ডাক্তারবাবুর কাছে শুভর জন্য সাইকেল কেনার টাকা চাইতে যায় তখন ডাক্তারবাবু তাকে কটু কথা শোনায়,

"সেকেন্ড হয়েছে বলেই যে তাকে সাইকেল কিনে দিতে হবে তার তো কোন মানে নেই। আজ সাইকেল চাইছে, কাল হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে বলবে, বাবা,এরোপ্লেন কিনে দাও- তখন পারবে তো ছেলের সখ মেটাতে?"[১৪]

এখানে অবনীর উত্তরটি ছিল লক্ষ্য করার মতো,

"যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে অবশ্যই এরোপ্লেন কিনে দেব। ছেলের জন্য কিনব- এতে তো আমার গর্ব হওয়া উচিত।"[১৫]

অনিল ঘড়াই যেন অবনীর মুখ দিয়ে এতদিন ধরে জমে থাকা উচ্চবিত্তের অহংকারের ভিতে আঘাত হানলেন। হলদিপোঁতা তে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়, সেই বন্যায় প্রায় সব ডুবে যায়, গ্রামের সবাই নিজের সুবিধামতো জায়গায় সরে যায়, ডাক্তারবাবু গ্রামের বড়োলোক শিবনাথবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়, কিন্তু ডুবতে বসা শুভদের তিনি আশ্রয় দেন না। মাধুরী শুভদের কথা বললে তিনি বিরক্ত হন, তিনি বলেন, "আমি কি করব বল? আমি রামমোহন হতে পারব না"। এমনকি অতসী দিদিমণি, যার সাথে অবনীর ভালো সম্পর্ক ছিল, সেও এই বিপদের দিনে শুভদের ফেলে চলে যায়। মানুষের স্বার্থপরতায় শুভ অত্যন্ত ব্যথিত হয়। আসলে নিম্নবিত্তদের সমাজে কোথাও যাওয়ার নেই, তাদের কাছে যতটুকু প্রয়োজন সবটুকু নিংড়ে নেয় এই সমাজ আর প্রয়োজন ফুরালেই তাদের দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই স্বল্পপুঁজির মালিক শুভদেরকেও রঘুনাথ বড়োলোক ভাবে, "তোরা খুব বড়োলোক, তাই না? রঘুনাথ বোকার মতো প্রশ্ন করে"। নিম্নবিত্তের সামাজিক অবস্থান যেন এক লহমায় পাঠক চিনে নিতে সক্ষম হয় রঘুনাথের এই একটি কথায়, আর এখানেই ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই এর সাফল্য।

উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি বারবার ফিরে ফিরে আসে সেটা হল স্বপ্নভঙ্গ, প্রায় সব চরিত্রের মধ্যেই স্বপ্নভঙ্গের মতো ঘটনা ঘটেছে। রঘুনাথ মালতীকে ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু গরীব ও আদিবাসী হওয়ার কারণে সুফল ওঝা মালতীর বিয়ে অন্য জায়গায় দিয়ে দেয়। রঘুনাথও চেয়েছিল আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো বাঁচতে, কিন্তু মালতীর বিয়ে হয়ে

যাওয়ার পর ডাকাতিকে পেশা হিসাবে বেছে নেয় এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে সে মালতীর বিয়ের দিন তারই বাড়িতে ডাকাতি করে এবং ধরা পড়ে। নিজের বাপ গুয়ারামের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা সে মনের ভিতর পুষে রাখে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। ডাকাত লুলারামের ইচ্ছা ছিল ঝারিকে বিয়ে করে গ্রাম থেকে চলে গিয়ে নতুন করে সংসার করতে, কিন্তু ঝারি গর্ভবতী হওয়ার পর তার মত পরিবর্তন হয়। সে লুলারামকে আর পাত্তা দিতে চায় না, তার মন আবার নতুন করে ভিকনাথে মজেছে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে লুলারামও শেষ পর্যন্ত মারা যায়। দুলু স্বপ্ন দেখত রূপসী মনোয়ারাকে বিয়ে করবে, কিন্তু মনোয়ারা হাতকাটা দুলুকে বিয়ে না করে পয়সাওয়ালা সাদাতকে বিয়ে করে। দুলু মনোয়ারার শোকে একপ্রকার পাগল হয়ে যায়। অন্যদিকে, ডাকাতের হাতে অকালে প্রাণ হারায় সাদাত, বিধবা হয় মনোয়ারা। মনোয়ারার সুখের বাগান অল্প সময়েই শুকিয়ে যায়। কপোতাক্ষবাবু ও বিদুরের আন্দোলনও মাঝপথে খেই হারায়, যেসব মানুষ তাদের কেন্দ্র করে নতুন সকালের স্বপ্ন দেখছিল সেটা কিছুটা হলেও যেন থিতিয়ে পড়ে। রঘুনাথের মা দুর্গামণি তার স্বামী গুয়ারামের মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে আগ্রহ হারায়, রঘুনাথের বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী বানিয়ে একসাথে থাকার পরিকল্পনা ছিল তার, কিন্তু গুয়ারামের আকস্মিক মৃত্যু, রঘুনাথের ডাকাতি শুরু করা- তার সব পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেয়। হরনাথের সুখের সংসার অকালেই ভেঙে যায়, মারণ কলেরায় তার বউ ও ফুটফুটে মেয়ে মারা যায়। সেই থেকে হরনাথ বিবাগী হয়ে যায়, শ্মশানেই থাকে সারাদিন, ডোমের কাজ করে। সুর্যাক্ষর ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা করে চাকরি করে বাবা মায়ের দুঃখ দূর করবে, দ্বীপীকে বিয়ে করবে। উচ্চ-মাধ্যমিকে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনাও শুরু করে। কিন্তু সেখানে তার আশানুরূপ ফলাফল হয়না, আবার এদিকে তার জেঠু নীলাক্ষবাবু তার বাবাকে ঠকিয়ে সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত

করে। এর ফলে, কপোতাক্ষবাবু টাকার সমস্যায় ভোগেন। সুর্যাক্ষ তখন প্রায় আকস্মিকভাবেই পেয়ে যায় মিলিটারির চাকরি। পড়াশোনা করে চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন দেখা যুবকের চাকরি হয় মিলিটারিতে, যদিও সুর্যাক্ষর অন্য বন্ধুদের কপালে সেটাও জোটে না, আর তাই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে হতাশার দীর্ঘশ্বাস,

"চাকরিটা আমার খুব দরকার ছিল। ভেবেছিলাম চাকরিটা পেলে বাবাকে আর চুল কাটতে দেব না। মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। ছ্যা।"[১৬]

এই 'ছ্যা' হয়ত লেখক সমাজের উদ্দেশে করেছেন, যেখানে নিম্নবিত্তের জন্য আছে শুধুই হতাশা আর ব্যর্থতা। 'অনন্ত দ্রাঘিমার' পরতে পরতে তাই নিম্নবিত্তের হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের ছবিই জড়িয়ে আছে।

যদিও উপন্যাসের মধ্যে এত স্বপ্নভঙ্গ ও বেদনার কথা থাকলেও শেষে কোথাও যেন লেখক আগামীরও ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন। সেই আগামী হয়ত নতুন বিদ্রোহের সূচনা করবে, সকলের সমানভাবে বাঁচার কথা বলবে এবং সবচেয়ে বড় কথা- হয়ত সেই আগামীর আসতে বেশি দেরিও নেই। বিপ্লব আসবেই, তাকে বেশিদিন দমিয়েও রাখা যাবেনা, আর এই বিপ্লব হয়ত আসবে 'সুর্যাক্ষের'-ই মতো কোন ছেলের হাত দিয়ে। রঘুনাথকে যখন নীলাক্ষবাবু চাবুক দিয়ে বেঁধে মারছে, তখন এই সুর্যাক্ষই প্রতিবাদ করে এগিয়ে আসে তার বাবা মায়ের শত নিষেধ সত্ত্বেও। দরজা আটকেও তার মা সুর্যাক্ষকে আটকাতে পারেনি। সে একা রুখে দাঁড়ায় রঘুনাথের ওপর হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আর তাই উপন্যাসও শেষ হয় আগামী বিপ্লবের আভাস দিয়ে,

"আগুন শব্দটায় ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। ভোরের বাতাস তাকে বুকে নিয়ে ছুটে যায় গাঙধারে। গাঙধার থেকে হলদিপোঁতা ধাওড়া হয়ে পণ্ডিত বিল। সেখান থেকে দোয়েম হরিনাথপুর

হাটগাছা হয়ে একেবারে চৌত্রিশ নাম্বার জাতীয় সড়কে। ঢেউ ছুটতে থাকে গ্রাম পেরিয়ে শহরের দিকে। বাতাস পদাবলি গায়,আগুনের পদাবলি।”[১৭]

তথ্যসূত্র

১) অনিল ঘড়াই, 'অনন্ত দ্রাঘিমা', কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ২১।

২) তদেব, পৃ. ১৫১।

৩) তদেব, পৃ. ১০৭।

৪) তদেব, পৃ. ১০৭।

৫) তদেব, পৃ. ৩৪১।

৬) তদেব, পৃ. ৫৯।

৭) তদেব, পৃ. ৫৮।

৮) তদেব, পৃ. ৫৮।

৯) তদেব, পৃ. ৭৯।

১০) তদেব, পৃ. ২৩৮।

১১) তদেব, পৃ. ২৩৮।

১২) তদেব, পৃ. ১৭০।

১৩) তদেব, পৃ. ২৫৯।

১৪) তদেব, পৃ. ২৬০।

১৫) তদেব, পৃ. ২৬০।

১৬) তদেব, পৃ. ৮৫২।

১৭) তদেব, পৃ. ৪৫৬।

উপসংহার

"শব্দ কাঁপে থরোথরো বুকের গহ্বরে

বুকের গহ্বরে ওঠে শুধু প্রতিধ্বনি

তুমি কি শুনেছ শব্দ? বুঝেছ কি তাকে?" [অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ, শিশিরকুমার দাশ]

শিশিরকুমার দাশের লেখা 'অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটির বক্তব্যের সাথে যেন লেখক অনিল ঘড়াই এর সাহিত্য জীবনের লেখার আদর্শ মিলে যায়। অনিল ঘড়াই সারাজীবন একটি আদর্শের দ্বারা চালিত হয়ে নিজের সাহিত্য কর্ম সম্পাদনা করেছেন, আর সেটা হল নিম্নবিত্তদের কথা বাংলা সাহিত্যে পাঠকের সামনে নিয়ে আসা। এতদিন পর্যন্ত যেসব দিক প্রায় অনালোচিত ছিল সেগুলোকে সাহিত্যের আলোয় তিনি নিয়ে এলেন। তিনি এই আশা নিয়েই এইসব কাজ করতেন যাতে বঞ্চিতরা কিছুটা হলেও আশার আলো দেখে। যদিও তিনি এই আশা করেন না যে তাঁর লেখা সকলেই বুঝবে বা তাঁর লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সবকিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু তাঁর লেখা যদি অল্প লোকেও পড়ে উপকৃত হয় এবং তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি আরও সাহিত্যিক পরবর্তীতে তাঁর মতো সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হয় তাহলেই তাঁর কাজ সার্থক হবে।

অদ্বৈতমল্লবর্মণের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গদের নিয়ে সাহিত্য রচনায় যে যুগান্তর এসেছিল তারই উত্তরসূরি বলা যেতে পারে অনিল ঘড়াই কে। পরবর্তীতে তাঁর মতো অভিজিৎ সেন, দেবেশ রায়, গুণময় মান্না প্রমুখ সাহিত্যিক এই একই ঘরানায় সাহিত্য রচনা করেছেন। যদিও এঁদের মধ্যে

অনিল ঘড়াই কে স্বতন্ত্র ধরার কারণ হল, তিনি নিজে জন্মগ্রহন করেছিলেন একটি নিম্নবর্গ পরিবারে। এর ফলে তাদের কথা জানার জন্য বা তাদের বঞ্চনার ইতিহাস জানার জন্য তাকে কারোর ওপর নির্ভর হয়ে থাকতে হয়নি। আর সে জন্যই তিনি বাকিদের থেকে স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গোরা' উপন্যাসের মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের সন্ধান করেছিলেন তাঁর নায়ক গোরার মাধ্যমে। অনিল ঘড়াই এর উপন্যাসেও এক অন্য ভারতবর্ষের ছবি দেখতে পাওয়া যায়, যে ভারতবর্ষ এতদিন পাঠকের অগোচরেই ছিল। আর তাই, তাঁর উপন্যাসের নায়ক কখনও একজন নির্দিষ্ট নয়। এক একটি উপন্যাসে অনেকগুলি প্রধান চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। 'অনন্ত দ্রাঘিমা' উপন্যাসেই যেমন কাহিনি কখন রঘুনাথ রাজোয়ার কেন্দ্রিক তো আবার কখনও সেই কাহিনি বিদুর বা শুভ কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, অনিল ঘড়াই তাঁর লেখার মধ্যে কোন একজন নায়কের সন্ধান করছেন না, বরং তিনি 'নায়কদের' সন্ধান করছেন। যে বা যারা হবে ভবিষ্যতের প্রজন্ম, যারা নিয়ে আসবে এক নতুন সকাল বিপ্লবের দ্বারা। আর তাঁর এই সন্ধান তাঁর শেষ লেখা পর্যন্ত চলেছে।

তিনি শুধুমাত্র নিম্নবিত্তের দুঃখ কষ্টের দিক দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং, তিনি বেশি করে তাঁর লেখায় এই শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে প্রেম, বিশ্বাস, যৌনতা ইত্যাদি বিষয় বেশি করে তুলে ধরেছেন। এইসব মানুষেরও যে একটা মন আছে সেটাই সবাই ভুলে যায়, শত দুঃখ কষ্টের ভিতরেও তারা যে নতুন করে বাঁচতে চায়, তারাও যে প্রেমে পড়ে, নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে সেইসব দিক গুলিকেই তিনি সবচেয়ে বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছেন।

বিশ্বায়নের প্রভাবে সারা পৃথিবীতে নানা ধরণের পরিবর্তন সূচিত হয়। এদেশেও তার প্রভাব লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে শহর কলকাতা নতুন করে সেজে ওঠে। শিল্প, কলকারখানা নির্মাণের ফলে

প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়। আর এসবের প্রভাব নিম্নবিত্তের মানুষদের মধ্যেও পড়ে। তারাও নিজেদের এই আপাত ব্যর্থ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শহরে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। জীবনটাকে তারা আবার নতুন করে শুরু করতে চায়, যেকোনো রকমের কাজ করে কলকাতা তেই তারা বাকি জীবনটা কাটাতে চায়। অনিল ঘড়াই এর উপন্যাসের কিছু চরিত্রের মধ্যেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। আবার কিছু চরিত্রের মধ্যে তাদের নিজেদের জন্মভূমি, ভিটেমাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকার এক অদম্য প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। তারা যেমন করে বেঁচে আছে তাতেই তারা খুশি। শত কষ্টতেও তারা নিজেদের জায়গা ছাড়তে রাজি নয়। তাঁর লেখা সব উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যেই এই দোলাচলতা লক্ষ করা যায়। হয়তো এই দোলাচলতা শুধুমাত্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদেরই নয়, বরং লেখকের নিজেরও। তিনি নিজেও এই 'বিশ্বায়ন'-এর প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেনি, নিম্নবিত্তের আগামীর ঠিকানা নিয়েও তাই তিনি হয়তো সন্দিহান।

অনিল ঘড়াই এর উপন্যাসের মধ্যে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় সেটা হল পুনরাবৃত্তি। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস পড়লে একটি জিনিস স্পষ্ট হয় আর সেটা হল একই ঘটনা বারবার ফিরে ফিরে আসা। তাঁর চরিত্রগুলো প্রায় একইরকম। দুঃখ-কষ্ট, অভাব, যৌনতা, মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বর্ণনায় বারবার একই জিনিস ফিরে ফিরে আসে। প্রায় সব চরিত্রের মধ্যেই 'পরকীয়া প্রেম' বিষয়টি লক্ষ করা যায়। তাহলে কি অনিল ঘড়াই এর উপন্যাসকে ব্যর্থ শিল্পকর্ম বলা যায়? তাঁর লেখার সাহিত্যমূল্য কি খর্ব হয়? তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কি প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে? সবকটি প্রশ্নের উত্তর হল- 'না'। তার কারণ হল, তাঁর লেখা 'সখের বাগানে শীতের রাত' এ তিনি স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে হয়তো তিনি যেটা লিখতে চান সেটাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না বলেই হয়তো তাঁর লেখায় এত পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে। যদিও, লেখকের এই উক্তিও পুরোপুরি

গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি যে শ্রেণির মানুষদের নিয়ে লিখেছেন, তাদের মধ্যেকার দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, তাদের স্বপ্ন প্রায় একই রকমের। তাদের মধ্যেকার যৌনতা, তাদের মানসিক বিকার, তাদের মধ্যেকার মূল্যবোধ এমনকি তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক সব কিছুর মধ্যে কোন বিশেষ ফারাক চোখে পড়ে না। আর সেজন্য, তাঁর লেখার এই পুনরাবৃত্তির মধ্যেই পাঠক নিম্নবিত্তদের সামগ্রিকভাবে খুঁজে নিতে সক্ষম হয়।

অনিল ঘড়াই এর প্রথম উপন্যাস 'নুনবাড়ি', তারপর তিনি হেঁটেছেন অনেকটা পথ। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২০০৯ সালে লেখা 'অনন্ত দ্রাঘিমা' উপন্যাসের জন্য তিনি পান 'বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার'। আর এই সময়ের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর লেখায়, তাঁর ভাবনায়। যে নায়কের সন্ধান তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনে করেছেন, হয়তো শেষ বয়সে এসে 'সুর্যাক্ষের' মধ্যে তিনি তাঁর নায়কের সন্ধান পেলেন।

অনিল ঘড়াই এর উপন্যাসের সবচেয়ে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল- এক নিয়ত আশাবাদের কথা তাঁর প্রায় সব উপন্যাস বলে। অনিল ঘড়াই এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র নিম্নবিত্তদের জীবনযাত্রা, কষ্টের বর্ণনা দেওয়া নয়। তাঁর লেখার মধ্যে স্বাভাবিক সূত্র ধরেই এইসব বিষয় পরপর এসেছে। কিন্তু, তিনি এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও উপন্যাসের শেষে আশাবাদের কথাই শুনিয়েছেন পাঠককে। দুঃখের সূর্য ডুবে গিয়ে একদিন আশার সূর্য উঠবে এই আশাবাদের সুর তাঁর সব লেখার মধ্যে ধ্বনিত হতে দেখা যায়। তাঁর লেখার মধ্যেকার এই আশাবাদ-ই তাঁকে এক সার্থক সাহিত্যিকের সম্মানে সম্মানিত করেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থপঞ্জি

১) অনিল ঘড়াই, ‘নুনবাড়ি’, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৪২৩।

২) অনিল ঘড়াই, ‘অনন্ত দ্রাঘিমা’, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, অগ্রহায়ণ ১৪২৪।

৩) অনিল ঘড়াই, ‘জন্মদাগ’, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪০৫।

৪) অনিল ঘড়াই, ‘নীল দুঃখের ছবি’, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪০৭।

৫) অনিল ঘড়াই, ‘মুকুলের গন্ধ’, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, মাঘ ১৩৯৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, 'আঞ্চলিকতা ও বাংলা উপন্যাস', কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ১৩৯৪।

২) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা', কলকাতা: দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৬।

৩) গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', কলকাতা: পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ১৯৯৮।

৪) জহর সেনমজুমদার, 'নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন', কলকাতা: পুস্তক বিপণি, জুলাই ২০০৭।

৫) তপোধীর ভট্টাচার্য, 'পড়ুয়ার ছোটগল্প', কলকাতা: একুশ শতক, জানুয়ারি ২০১৩।

৬) দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা), আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি 'লোকশ্রুতি' প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অক্টোবর ২০০৪।

৭) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-২০১৭।

৮) শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে ওরা', কলকাতা: প্যাপিরাস, জানুয়ারি ১৯৯৬।

৯) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৮০।

১০) সুবোধ দেবসেন, 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ', কলকাতা: পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০১০।

পত্রপত্রিকাপঞ্জি

১) দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), ‘পরিকথা’, দ্বিতীয় সংখ্যা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: মে ২০১৪।

২) পৃথ্বীশ সাহা (সম্পা), দিবারাত্রির কাব্য, ‘বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গ নির্মাণ: একটি খসড়া’, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা: ২০১৪।

বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি

১) ওয়েব লিঙ্ক- http://www.successbangla.com/2018/01/blog-post_41.html?m=1,

Date 14-03-2019, Time 11 a.m .

২) ওয়েব লিঙ্ক-

https://www.google.com/amp/s/eisamay.indiatimes.com/editorial/post-editorial/editorial-on-late-author-anil-ghorai/amp_articleshow/45511627.cms,

Date 15-03-2019, Time 5 p.m .